খেয়া
৫১তম বর্ষ, ১৪৩২

খেয়া সম্পাদকমণ্ডলী

জ্যোতিষ্ক গাঙ্গুলী (প্রধান সম্পাদক)
সোম গাঙ্গুলী (সদস্য)
সৌমিত্র গুহ (সদস্য)
অশোক নন্দী (সদস্য)
দীপক বাগচী (সদস্য)
কৌশিক ভট্টাচার্য্য (সদস্য)

Kheya Editorial Board

Dipak Bagchi (Member)
Kausik Bhattacharya (Member)
Jyotishko Ganguly (Editor-in-Chief)
Som Ganguly (Member)
Soumitra Guha (Member)
Asok Nandi (Member)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

সম্মুখের ও পশ্চাতের প্রচ্ছদ:	সৌমি নন্দী
পৃষ্ঠার অঙ্গ বিন্যাস:	কৌশিক ভট্টাচার্য্য
বাংলা হরফ সাজানো:	খেয়া সম্পাদকমণ্ডলী
ভিতরের অলঙ্করণ ও উদ্ধৃতি:	কৌশিক ভট্টাচার্য, শ্যামল দে ও দীপক বাগচী
ভ্রম সংশোধন:	দীপক বাগচী, সোম গাঙ্গুলী ও সৌমিত্র গুহ
প্রযুক্তিগত সহায়তা:	কৌশিক ভট্টাচার্য্য
প্রকাশিত:	**অক্টোবর ৩, ২০২৫**

খেয়ায় প্রকাশিত রচনা কেবলমাত্র লেখক বা লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, খেয়া সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত নয়। কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী পাঠকপাঠিকাগণের ক্ষমা প্রার্থী।

Kheya is prepared by the Editorial Board of KHEYA and published by the Publication Committee of Bengali Association of Southern California (BASC).

সূচীপত্র

Table Of Contents

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 2

§ সম্পাদকীয় 5

§ Editorial 6

§ কবিতা:

মা সারদামনি / দীপক বাগচী 7

ভালো থেকো / সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় 8

ডিজিটাল অপেক্ষা / অশোক নন্দী 14

মুসাফিরখানা / পিনাকী চক্রবর্তী 14

প্রচেষ্টা / অর্পিতা মিত্র 35

প্রগতি সর্বদা সহজে আসে না / দীপক বাগচী 42

প্রতিবাদের ভাষা চাই / প্রণব মিশ্র 53

§ গল্প/প্রবন্ধ/ ভ্রমণকাহিনী:

সেদিন অগ্নিঝড়ে / মদন গোপাল মুখোপাধ্যায় 9

আজকের সিণ্ডারেলা / সোমনাথ সরকার 15

প্রতিদান / বুলা চ্যাটার্জি 26

প্রদীপমেসোর বিপদ / দীপক বাগচী 36

খোলা মনে / প্রদ্যোৎ গুপ্ত 38

§ গল্প/প্রবন্ধ/ ভ্রমণকাহিনী:

গীতার বিচারে খাদ্য ও অখাদ্য / সুকুমার পাল 43

অ্যাণ্টার্কটিকার অঙ্গনে / শিখা কুণ্ডু 46

§ বিবিধ:

দেবী দুর্গা / মদন গোপাল মুখোপাধ্যায় 4

ভারত আবার জগত-সভায় / অশোক নন্দী 28

§ Stories/Essays/Travelogue:

A Study in Hues, Heat and Height / Sabyasachi Mitra 54

Life — a Sojourn / Saheli Majumdar Banerjee 60

Anubrata's Awakening / Jyotishko Ganguly 63

Ghatotkach / Pinaki R Chakrabarti 68

The Walking Chef / Debasree Sona Callender 73

An American President I Truly Admired / Benoy R. Samanta 81

Arka's Musings / Som Ganguly 87

Rules for Article Submission to Kheya 91

দেবী দুর্গা

সংগ্রাহক: মদন গোপাল মুখোপাধ্যায়
বিশেষজ্ঞ: প্রতাপাদিত্য পাল
লস এঞ্জেলেস।

মিশ্র ধাতু, মূলত পেতলে তৈরি দেবী দুর্গার এই মূর্তিটি সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হচ্ছে। মূর্তিটি বাংলায় তৈরি। প্রাপ্তিস্থান অজানা। তবে মূর্তিটি যে গৃহস্থ বাড়িতে পূজিত হতো তা নিশ্চয় বোঝা যায় মূর্তির মাথায় সিঁদুরের চিহ্ন দেখে।

সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী দেবীর মূর্তিটি শাস্ত্রমতে তৈরি। মূর্তির শীর্ষে চালচিত্রের চুড়ায় শিবের প্রতীক হিসাবে ত্রিশূলের ব্যবহার লক্ষণীয়। ত্রিশূলের তলায় দু'দিকে দু'টি ময়ূর শোভাবর্ধনকারী। মূর্তিটির পাদদেশে মহিষের ছিন্ন মস্তক দেখা যায়। দেবী মহিষাসুরকে বধ করছেন ডান হাতে দীর্ঘ আয়ুধ দিয়ে। অসুর দেবীর হাতে আসন্ন মৃত্যুকে বরণ করছে দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে। ভারী সুন্দর এই সমর্পণের ভঙ্গি।

সম্পাদকীয়

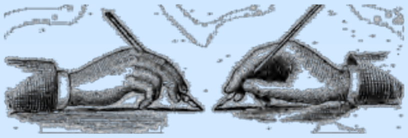

শরতের আকাশে উঠছে ঢাকের ধ্বনি, ছড়াচ্ছে শিউলির সুবাস। মা দুর্গা আসছেন, আসছে উৎসবের আনন্দ। আমেরিকার বুকে একসাথে মিলিত হয়েছি আমরা। আমরা সবাই নাচ, গান আর হাসি নিয়ে উদ্‌যাপন করবো আমাদের প্রিয় দুর্গাপূজার মিলনমেলা। আসুন, সেই সঙ্গে নিজেদের শিকড় ও সংস্কৃতিকে আবার নতুন করে ছুঁয়ে দেখি এই প্রবাসের মাটিতেই।

আজকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা AI (*এআই*) অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই প্রযুক্তি নিয়ে চলছে নানামুখী আলোচনা — কেউ দেখছেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আবার কেউ আশঙ্কা করছেন এক অন্ধকারময় পরিণতির।

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় স্বয়ংক্রিয় অ্যাসেম্বলি লাইন এখন আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে, যা উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এআইয়ের ব্যবহার রোগ নির্ণয়কে আরও নিখুঁত করছে এবং গবেষণা কার্যক্রমে গতি আনছে। শিক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহন — জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এআই আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে।

তবে, মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। এআইয়ের উত্থান সমাজের জন্য কিছু বড় চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসছে। প্রথমতঃ, কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, এআই এবং রোবটিক্স অনেক প্রচলিত পেশাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। বিশেষ করে ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টারে কোডিংয়ের মতো কাজে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে যেতে পারে।

এছাড়াও, এআইয়ের অপব্যবহার এক মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটি হলো সামরিক ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার। এআইয়ের সহায়তায় তৈরি স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র বা যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বিশ্বকে এক নতুন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এসব সম্ভাবনা ও আশঙ্কা মিলিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। এআই প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এর সঠিক ব্যবহার আমাদের সমাজের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে, কিন্তু এর অপব্যবহার হতে পারে এক ভয়ংকর অভিশাপ।

শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সবাইকে।

———— খেয়া সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে

অশোক নন্দী

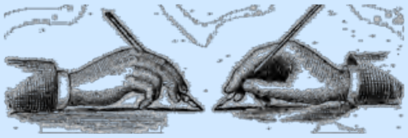

Editorial

Dear BASC Members:

Wish you and your family a joyous autumn and a gleeful worship of Ma Durga. Despite 1200 years of concatenated subjugation by at least five major present-day nations of the world, India is now poised as the fourth largest economy in the world. This year it surpassed Japan. The IMF assesses that resilient India's nominal GDP is hovering around $4.187 trillion. French philosopher and historian Francois Voltaire (1694-1778) once said, "... everything has come down to us from the banks of the Ganges."

Sayanacharya's observation on Rigveda 1.50.4 states that "sunlight travels 2,202 yojanas in half a *nimisha*." When ancient units of measurement are converted into modern terms: *Yojana:* One yojana is generally considered to be roughly 9 miles, though estimations vary. *Nimisha:* A nimisha, as described in texts like the Mahabharata, is approximately 0.2112 seconds, meaning half a nimisha is about 0.1056 seconds. By using these values, the calculation yields a speed of approximately 187,670 miles per second, which is quite close to the modern scientific measurement of 186,282 miles per second.

Ancient Indian Sage Yajnavalkya's theory of heliocentrism, mentioned in the Vedic text Shatapatha Brahmana (part of the Yajur Veda), proposes the sun as the center of the spheres and acknowledges its larger size compared to the Earth.

The Atharva Veda Prathama Kanda 11.4 discusses the removal of the placenta after childbirth. As per WisdomLib.org and Quora, Hymn 11 of the first book of the Atharva Veda includes a Sukta (hymn) for a safe childbirth. The mantras address the successful delivery of the placenta, since it can be occasionally retained in the uterus and cause fatal infections (89.1 of the Rig Veda).

One ends with the prayers that your progeny and other loved ones may someday give the world such gems as outlined above. Best wishes to you and your family.

——— Jyotishko Ganguly
On behalf of the Kheya Editorial Board.

মা সারদামনি

দীপক বাগচী

(১)

ওগো মা সারদা, তুমি আসি’ এ ধরায়
রেখেছ দৃষ্টান্ত নানা, যা’ অসাধারণ,
যাহা দেখি’ বিশ্বময় ভক্তকুল পায়
জানিতে — কেমনে তারা কাটাবে জীবন।

(২)

সরলতা, পবিত্রতা তোমার প্রকৃতি;
প্রজ্ঞা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা তব আভরণ;
তুমি মূর্ত শান্তি মাগো, তুমি স্নিগ্ধ স্মৃতি,
তুমি মাগো সরস্বতী, করি যা’ মনন।

(৩)

ভগবানের প্রমান — তুমি সেইজনা;
উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে ক্রোড়ে নেছ টানি;
গোঁড়া সে সমাজে ছিলে আধুনিকমনা;
বিশ্বের জননী গেছ বরাভয় দানি’।

(৪)

তোমার করুণাধারা বরিষ মা শিরে;
বিবেক ও ভক্তি দাও ভরি’ মোর হিয়া;
অন্তিমেতে দিও দেখা, এ প্রার্থনাটিরে —
পুরিও গুরু, তুমি ও ঠাকুর আসিয়া।

ভালো থেকো

সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়

নিজেকে ভালো রেখো
নিজেকে ভালবেসো
কষ্ট পেলে কেঁদো
সুখেতে তুমি হেসো।
মেঘেতে মুখ ভার
আকাশ দেখোনি?
বৃষ্টি ঝরে গেলে
হাসবে এখনই।
সে হাসি রোদ্দুর
শরীরে মেখে নিও
ভাবনা ভয়গুলো
বাতাসে ছুঁড়ে দিও।
তোমাকে চায় যারা
তাদের কাছে ডেকো
দূরেতে ঠেলেছে যে
তাকেও মনে রেখো।
দেবে তো নিশ্চই
যাকে যা দিতে চাও
তার আগে ভেবেছো?
কি তুমি নিজে চাও?

"আমি"টা খুব দামী
যত্ন করো তার,
সময় হাতে কম
কোরো না দেরী আর।
সাজালে বাইরেটা
সাজিও মনটাও
ভালোর জন্যই
নিজেকে পাল্টাও ।
আসুক মৃত্যু
ব'লে বা না ব'লে ।
বাঁচার প্রতিদিন
গুনো না তা বলে ।
বন্ধু প্রিয়জন
থাকলে সঙ্গে
চলাটা সোজা হয়
বাঁচাটা রঙ্গে।
না যদি কেউ থাকে
একলা ভালো থেকো
নিজেকে ভালবেসে
নিজেকে ভালো রেখো।

চিত্রশিল্পী: শ্যামল দে

সেদিন অগ্নিঝড়ে

মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়

আলোছায়ার আলপনা আঁকা জীবনের যে পথ এতকাল নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমায় নিয়ে চলেছিল এক অজানা গন্তব্যে, সেই পথই যে জীবন সায়াহ্নে এমনি ভাবে একদিন এক চরম সর্বনাশের কৃষ্ণগহ্বরে আমায় এনে হাজির করবে তা কে জানতো? এ পথের কোনও মানচিত্র নেই, কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, কখন যে কী ভাবে এই পথচলা শুরু হয়ে কোথায় যে আমাদের নিয়ে যায় তাও চির অজানাই থেকে যায় আমাদের জীবনে।

আমার জীবনতরীটি মৃদু মলয় হাওয়ায় পাল তুলে তার আপন ছন্দে বেশ চলছিল, তারপর যখন কুয়াশায় আছন্ন ভবিষ্যতের চাদরের সামান্য ফাঁক দিয়ে ওপারের নদীতীরটি চোখে পড়লো তখনই কী যে হলো, তরী আমার তীরে এসে অকস্মাৎ অচিন্তনীয় এক দুর্ঘটনায় অভাবনীয় ভাবে ডুবে গেল। ভাগ্য বিধাতার সেই নির্মম পরিহাসের কথাই আজ আপনাদের বলতে বসেছি, পাঠক শুনুন।

বহুদিন আগে এই সসাগরা বিরাট পৃথিবীর এক কোণে আমি ঠাঁই পেয়েছিলাম এক পাহাড়ের কোলে পাইন, পাম, ওক গাছেদের নির্মল সবুজ ছায়ার আশ্রয়ে। আমি ভালবেসেছিলাম ধরিত্রীর এই বিজন কোণটিকে। রচনা করেছিলাম আমার অবসরের নীড়টিকে পরম যত্নে, ভালোবাসায়। তাকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলেছিলাম নানা চিত্র সামগ্রী, বিচিত্র আসবাব আর আমার প্রিয়, দুর্লভ প্রাচীন পুস্তক সম্ভারে।

বাগানের কুসুমিত সৌন্দর্যে, সঙ্গীতের সুরের বহমান প্রবাহে আমার জীবন ও ছোট বাসাখানি আনন্দে আর শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সকালের প্রথম আলোয় যখন বাইরে এসে দাঁড়াতাম তখন শৈলশ্রেণী বলতো আয়, ওক গাছগুলো ডাকতো আয়, হিমালয়পুত্র দেওদার ঝালর দুলিয়ে সাদরে মাথা নাড়তো, আমি জানতাম তার ভাষা, বুঝতাম আমায় দেখে সে খুশি হতো।

বাড়িটি ও বাগানটিকে দেখে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছিলাম। প্রায় এক যুগ আগে সবে তখন নতুন করে বাড়িটি তৈরি করেছেন স্কট সাহেব। অনেক দিনের বাড়ি, সেই উনিশশো সাতাশে প্রথম তৈরি, তারপর কত গ্রীষ্ম, কত শীত, কত খরা, কত ঝড় ঝাপটাই না গেছে এর শরীরের ওপর দিয়ে, শেষে একদিন সর্বনেশে এক আগুন সব গ্রাস করলে বাড়িটার। পরম করুণাময় যিশুর পবিত্র জন্মদিনে চার্চে প্রার্থনা করে এসে স্কট দম্পতি দেখলেন বাড়িটা পুড়ছে। সবাই দেখলে দাউ দাউ করে জ্বলছে হুতাশন।

ভিড় করে এলো পাড়ার লোকেরা, দমকল এলো ঘণ্টা বাজিয়ে, পুলিশ এলো সাইরেন বাজিয়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। একরাশ স্বপ্ন ইলেকট্রিক শর্ট শার্কিটে ধূসর ছাই হয়ে গেল চোখের সামনে।

সাহেব বললেন, আমি আবার গড়বো আমার স্বপ্নের বাড়িটিকে। শুধু গড়বো না, আরও আধুনিক করবো একে, আরও সাজাব একে সুন্দরতর করে। সাহেব কথা রেখেছিলেন, নতুন করে গড়েছিলেন অগ্নিদগ্ধ নীড়টিকে। কিন্তু একবার ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে আর জোড়া লাগাতে পারলেন না। জোড়া লাগানো যায়না। ওই স্বপ্নগুলো তো অলীক। ওরা মোহ, ওরা মায়া, ওরা মরীচিকা। সাহেব বিক্রি করে দিলেন তাঁর স্বপ্নকে।

আর এই আমি সেই কত দূরের কলকাতা থেকে এসে সাহেবের ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে দেখে আবার প্রেমে পড়লাম। প্যাসাডিনার সমতল ভূমি থেকে আলটাডিনার উচ্চতায় ওক, পাইন, আর দেওদারের ছায়ায় শুরু হলো আমার অবসর জীবন।

নতুন করে গাছ লাগানো হলো বাগানে। ভুলতে না পারা পরিচিত আম, লিচু, পেয়ারা, বেদানা গাছে সাজলো আমাদের সাধের বাগান। অনাদরে শীর্ণ হয়ে যাওয়া লেবু গাছগুলোতে প্রাণ এলো, হাসি ফুটলো অলিভের, ইউক্যালিপটাস খুশি হলো। গৃহিণী আনলেন ক্যামেলিয়া, ক্লিভিয়া, ক্যাকটাস। এক ধারে হলো গোলাপ বাগিচা, আর একদিকে সৌরভে আমোদিত করলো চাঁপা আর গন্ধরাজ। সাত সমুদ্দর তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর ওড়িশা থেকে এলো লক্ষ্মী, সরস্বতী, বুদ্ধদেব। অন্দরমহলে এলেন অবন ঠাকুর, যামিনী বাবু, মকবুল সাহেব, বিকাশদা, রামানন্দদা, হেমেন মজুমদার।

এলেন মোগল, রাজপুত, কাংড়া, কোম্পানি, সল্ট, ড্যানিয়েল। আর এলেন মনু, ওয়ার্ড, মার্শমান, রামমোহন, আর রবীন্দ্রনাথ। ঘর ভরে উঠল বই আর ছবিতে, গান্ধার আর গুপ্ত, পাল আর মোগলে। এলো আগ্রা থেকে কারুকার্যে অপরূপ মার্বেল, চিন থেকে, তুরস্ক থেকে পারস্য থেকে কার্পেট, ইউরোপ থেকে, শ্রী লঙ্কা থেকে, ভারত থেকে ভাস্কর্য।

আমার আমেরিকান ড্রিম, আমার বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক হলো বুঝিবা।

আর তারপর এলো সেই ঝড়।

জানুয়ারি ৬, ২০২৫, মঙ্গলবার পাহাড়ের বুক থেকে বইতে শুরু করলে এক অশুভ হাওয়া। শীতের শেষ বেলা, দিবাকর তখন পশ্চিম দিগন্তে, কালো হয়ে এলো আকাশ, কি এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলো গাছপালাগুলো, কাঁপতে লাগল চরাচর। পাড়াটা কেমন একটা অন্য রূপ নিলে, কেমন একটা অপার্থিব থমথমে ভাব চারদিকে।

রাস্তার দু'পাশের বড় বড় প্রাচীন বৃক্ষেরা ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে যেন বলতে লাগলো না, না, না। ক্রমে ঝড়ের বেগ বাড়তে লাগলো ষাট, সত্তর, আশি, নব্বুই, একশো। ভেঙে পড়তে লাগলো পাইনের ডাল, খেজুর গাছ আর পাম গাছের বড় বড় পাতা গুলো। জবা, শিরিষ, ডুমুর, কর্পূর গাছগুলো লন্ড ভন্ড হয়ে লুটতে থাকলো মাটিতে। বীভৎস হয়ে উঠল আমাদের সামনের রাস্তা, ড্রাইভওয়ে, যত্নে রাখা সবুজ লন।

আমাদের প্রিয় পাড়াটা যেখানে পড়শিরা পূর্ণিমার রাতে মিলিত হতাম সকলে, গান গাইতাম মনের আনন্দে, পান ভোজনে পৃথিবীর নানা প্রান্তের বন্ধুরা হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধুত্বের রাখি বাঁধতাম, সেই সুন্দর পাড়াটা দেখতে দেখতে এক ভয়াবহ রূপ নিলে। আর তারপর হঠাৎ সব আলো গেল নিভে।

টি ভি বন্ধ হলো, ইন্টারনেট বন্ধ হলো, টেবিলে রাখা টেলিফোন অচল হলো। বিদ্যুৎ যাওয়া মানে আধুনিক জীবনযাত্রা সহসা স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। বিদ্যুৎ যাওয়া মানে গ্যারাজের দরজা খুলবে না, গাড়ি যাবার গেট খুলবে না, রান্নার আগুন জ্বলবে না, রেফ্রিজারেটরে শাক সবজি মাছ মাংস পচতে থাকবে।

আমরা দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা হঠাৎ বড় অসহায় বোধ করলাম। ঘরে বাইরে অন্ধকার, তার ওপর ক্রমবর্ধমান ঝড়ের তাণ্ডব আমাদের বিভ্রান্ত বিমূঢ় করে দিলে। টর্চের আলোতে দেখতে পেলাম উঠোনটা ঝরা পাতা, ভাঙা ডাল, ভেঙে যাওয়া ফুলের টব, উল্টে যাওয়া টেবিল, চেয়ার, ছাতা আর গড়াগড়ি যাওয়া ট্র্যাশ ক্যানে এক বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।

বাইরে ঝড় আরও প্রবল হলো। বেড়ার ধারে ষাট সত্তর ফুট উঁচু ইউক্যালিপটাস গাছটা বিপদজ্জনক ভাবে দুলতে থাকলো, এই বুঝি ভেঙে পড়ে বাড়ির ওপর। কিন্তু বিদ্যুৎ গেল কেন? কে জানে কেন। হয়তো গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে লাইনের ওপর, হয়তো বড় বড় স্তম্ভ গুলো মাটিতে পড়েছে, হয়তো বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে দাবানলের আশঙ্কায়। যাইহোক আমরা বড় বিপদে পড়েছি, বড় আশঙ্কিত, বড় অসহায়, বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এই প্রবাসে একান্ত নির্জনে অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে গেছি মনে হচ্ছে। দু'একবার দরজা খুলে বাইরে বের হবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাওয়ার এত জোর যে দরজা খুলতেই পারছিনা, প্রবল এক শক্তি যেন ঠেলে আমায় ভেতরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাইরে এক তাণ্ডব চলছে পুরোদমে। মনে হলো কোন এক অজানা মহাশক্তি কি এক দু:সহ ক্রোধে যেন এই পৃথিবীটাকে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে পাগলের মতো।

এমন সময় মুঠোফোনটা বেজে উঠল, ছেলের গলা, "তোমরা কেমন আছ?"

"বড় বিপদের মধ্যে আছি।"

"এখুনি বেরিয়ে পড় তোমরা, পাহাড়ে পাহাড়ে আগুন লেগেছে, আমাদের এদিক থেকে তোমাদের ওদিকে যাচ্ছে আগুন, দরকারি জিনিস যা পাও নিয়ে বেরিয়ে পড়, আর এক মিনিট দেরি নয়।"

মনটা কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে এই অন্ধকার বিপদের মধ্যে কোথায় যাব? কী নিয়ে যাব?

তবু সেই প্রলয়ের মধ্যে ছোট দুটো ক্যারিঅনে কিছু দরকারি কাগজপত্র নিয়ে কোনও রকমে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

পুব আকাশ তখন লাল হয়ে গেছে, এমন ভয়ঙ্কর আকাশ কখনও দেখিনি। আগুনের তাপ অনুভব করছি হাওয়ায়, দেখছি বরফের কুচির মতো ছাই উড়ছে হাওয়াতে। চারদিক ছেয়ে গেছে ধূসর ভস্মে।

গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা যে এতদিনের আবাস ছেড়ে যাচ্ছি এই রাত্তির বেলায়। কোথায় যাব জানিনা, কোথায় থাকবো জানিনা, কখন ফিরব জানিনা কিন্তু বিশ্বাস, ফিরব নিশ্চয় সকাল হলে, তাহলে কোনও পার্কিং লটে কিছুক্ষণ থেকে ঝড় থামলে ফিরে আসবো এমনটাই ভাবলাম আর গেটের কাছে আসতে গেটটা ঘড় ঘড় করে খুলে গিয়ে আমাদের বের হবার রাস্তা করে দিলে। বেরিয়ে পড়লাম দুর্যোগ মাথায় নিয়ে, আর তখুনি মনে পড়লো বিদ্যুৎ চালিত গেটটা খুললো কী ভাবে? আর না খুললে যে কী হতো তা ভেবে গায়ে রোমাঞ্চ হলো। মনে মনে প্রণাম জানালাম সেই বিধাতাকে যিনি বুদ্ধি দেন এই রকম জরুরি অবস্থার জন্য সময়মত ব্যাটারি বসাতে।

সেই অভিশপ্ত রাতের সাতকাহন আর একদিন বলা যাবে, এখন বলি পরদিন ভোরের অভিজ্ঞতা। বাড়ি ফেরার জন্য তখন মন আনচান করছে, মুঠোফোনে বার্তা এসেছে আমার বাড়িতে আগুন লেগেছে, কিন্তু মন থেকে সেই দু:সংবাদ মানতে পারছিনা তখনও। কিন্তু একটু যেতে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে সব আশা উবে গেল। চরম আশঙ্কায় হতাশ হয়ে গেলাম। রাস্তা জনশূন্য, কোন পুলিশ প্রহরা নেই, কোন দমকল নেই। যে দিকে তাকাই একটার পর একটা ভস্মীভূত বাড়ি, বড় বড় গাছগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে, বিদ্যুতের তার রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে এদিক সেদিক। ভেঙে পড়ে আছে গাছের বড় বড় ডাল, বিদ্যুতের থাম, লোহার বেড়া। মোড় ঘুরতেই দেখি পাড়ার চার্চটা থেকে দাউ দাউ করে আগুন বেরিয়ে আসছে আর তার পাশের কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, যেখানে আমার নাতি নাতনি পড়েছিল একদিন, সেটাও পুড়ছে।

আমাদের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালাম। পুরো বাড়িটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধু সামনের পাথরে তৈরি দরজাটা বিপদজনক ভাবে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। গ্যারেজের দরজাটা ভেঙে পড়ে আছে, দেখা যাচ্ছে আমাদের দুটো প্রিয় গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। বড় বড় গাছগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আমার দশ বছরের বন্ধু, সমুন্নত দৃঢ় দেহী, উন্নত শির, আমার প্রিয় দেওদার আপাদমস্তক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃতপ্রায়।

ভাঙা কাচ, ছাই, প্রচুর পেরেক, আর দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া লোহা, পাইপ, বিদ্যুতের তারের বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে সাবধানে বাড়ির কাছে এসে দেখলাম তখনও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমাদের বসার ঘরের ধ্বংসস্তূপ থেকে। গৃহিণী চোখে আঁচল দিলেন। ছেলে চারদিকের ছবি তুলতে লাগল। আমার কেমন এক বিপন্নতা বোধ হলো।

মনে হলো যেন আমার কোন প্রিয়জনের প্রজ্বলিত চিতা দেখছি। মনে হলো, এক মৃত্যু শোক আমায় আচ্ছন্ন করে দিল। গুণে গুণে দেখলাম আমার সামনে ত্রিশটা লোহার বইয়ের তাকে শুধু ছাই জমে আছে। তিল তিল করে তৈরি করা আমার সাধের লাইব্রেরির এই পরিণতি দেখে আমার চোখে জল এলো না, বৃহৎ শোকে বুঝি এমনিই হয়। মনে হলো, এ এক মৃত্যুই বটে। আমার নিজের মৃত্যু আমি নিজে দেখছি যেন। পরে আমার মনে হলো, আমরা যা কিছু সংগ্রহ করি জীবন জুড়ে তা তো মরণ এসে এক নিমেষে সব হরণ করে নিয়ে যায় একদিন, আমাদের কোন কিছু সঞ্চয় তো আমরা নিয়ে যেতে পারি না, বাধ্য হই সব ছেড়ে পরপারে পাড়ি দিতে।মৃত্যুর কাছে আমাদের কোন জোর চলেনা। আজ মনে হলো আমার যাবতীয় সঞ্চয়, সংগ্রহ, আমার কাছ থেকে আগুন হরণ করলে, আমার কোন জোর, কোন আবদার তো হুতাশন বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেনা।

তাই মনে হলো এই অভিজ্ঞতা যেন মরণের এক প্রতিরূপ, বেঁচে থেকে মরা। আবার মনে হয়, জীবনে হয়তো এরকম আঘাতেরও প্রয়োজন আছে, নয়তো জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। এই উপলব্ধিও হলো যে আমরা যত বেশি করে পার্থিব জিনিসকে আঁকড়ে ধরি তত বেশি করে কষ্ট পাই জীবনে সেই জিনিস হারালে।

অনুভব করলাম যা গেছে তা তো সবই অনিত্য, ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী মোহ মাত্র। অগ্নিস্নানে শুচি হয়ে উঠে আমি উপলব্ধি করলাম যে ভিন্নতর এক মৃত্যুর মধ্যে থেকে আমার এক নবজন্ম হলো।

ডিজিটাল অপেক্ষা

অশোক নন্দী

সবাই বলছে আমি অপেক্ষা করছি।
এটা মথুরা নগরের একটি খেলা,
সুন্দর হাসিখুশি অনেক সখা সখী
কেউ একে অপরকে চেনে না।
যখন তারা দেখা করে তারা এড়িয়ে যায়
তাদের স্বপ্নের খেলা ভেঙে যায়।
কর্পোরেট জগৎ এই খেলাটিই জানে
তারা এই সাইটগুলি ব্যবহার করে,
প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।
ভালোবাসা ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মাঝে আসে
চোখের নজরে, হাসি আর কণ্ঠস্বরে
পরশ ও চাওয়ার আকুলতায়।
এই ডিজিটাল দুনিয়ায় অনেকে আসে বেরাতে
কিছু পেতে আর নিজেকে রূপ সাগরে ভাসাতে।

মুসাফিরখানা

পিনাকী চক্রবর্তী

মুসাফিরখানায় বসে আছে,
সবাই বসে আছে, বেশ কিছুক্ষণ।
সবাই ভাবছে, একই কথা ভাবছে,
গাড়ী কখন আসবে?

তারা একে অন্যের দিকে দেখছে,
কখনও বলছে দু'একটা কথা
আবার এদিক ওদিক দেখছে,
তবে মনে সেই একই প্রশ্ন—
গাড়ীটা কখন আসবে?

গাড়ীটা আসবে ঠিকই, কিন্তু কখন?
সেটা কেউই বলতে পারছে না।
কিন্তু জানে, গাড়ীটা ঠিকই আসবে,
তার কখনো অন্যথা হয় না।

শেষে গাড়ীটা ঠিকই এল,
সবাই উঠল তাতে, তাড়াহুড়ো করেই উঠল।
কোথায় নামতে হবে তা তারা জানেনা,
তবুও নামল, কে কোথায় নামল তা তারা জানে না,
আর দেখা হবে না, তবুও তারা নামল।

মুসাফিরখানায় এখন অন্য লোক,
তারাও অপেক্ষা করছে,
অস্থির ভাবে, ঠিক আগের মত,
একে অন্যকে দেখছে, আর ভাবছে,
গাড়ীটা কখন আসবে?
গাড়ীটা আসলে তারাও উঠবে।

আজকের সিণ্ডারেলা

সোমনাথ সরকার

"একসময়, এক দূর রাজ্যে, সিণ্ডারেলা নামে এক তরুণী বাস করত। সে ছিল এক দয়ালু, কোমল এবং সুন্দরী মেয়ে, যার হাসি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। সিণ্ডারেলার হৃদয় ছিল ভালোবাসায় ভরা, কিন্তু ভাগ্য সিণ্ডারেলার প্রতি সদয় ছিল না। তার মা মারা যান, তাকে তার স্বার্থপর সৎ মায়ের কাছে একা রেখে" – এই পর্যন্ত বলে বিদিশা দেবী একটু হাসলেন। "নাঃ, এই জায়গাটা পাল্টাবে। আমাদের সিণ্ডারেলার কোন সৎ মা ছিল না। সে ছোটবেলাতে বাবা ও মা দুজনকেই হারায়।"

কথা হচ্ছিল নিউ আলিপুরে বিদিশা দেবীর সুসজ্জিত ড্রইং রুমে বসে। একসময়কার ডাকসাইটে অভিনেত্রী, এখন বয়েস হয়েছে, অভিনয় থেকে সরে এসেছেন প্রযোজনায়। ডেকে পাঠিয়েছেন চিত্রনাট্য লেখার জন্য রিমঝিমকে। ইদানীং কতগুলো সিনেমার চিত্রনাট্য লিখে অল্পবয়সে বেশ নাম করেছে রিমঝিম। সবগুলোই হিট। বিদিশা দেবী বললেন, "একটা ভাল প্লট আছে।" আর বলতে শুরু করলেন সিণ্ডারেলার গল্প।

- "আচ্ছা, মেয়েটির একটা নাম তো দেবেন?" রিমঝিমের গলা একটু অধৈর্য শোনায়।

- "যা খুশি দিয়ে দাও না। ধর, রুক্মিণী।"- "ঠিক আছে। বলতে থাকুন," কফিতে চুমুক দেয় রিমঝিম।

- "ঘটনাটা সত্তরের দশকের প্রথম দিকের। নকশাল আন্দোলন স্তিমিত। রুক্মিণীর এক দাদা, আর কোন ভাই বোন নেই। বাবা কাজ করতেন পোর্ট ট্রাস্টে। পাশাপাশি গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে একটা চেম্বার ছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার। তবে চাকরি ও ব্যবসা একসাথে করার কিছুটা আইনগত সমস্যা থাকায় চেম্বারটা ছিল রুক্মিণীর ঠাকুরদার নামে। ১৯৭০-৭১এ নকশাল আন্দোলনে অনেক টেনশন গেছে। বাবা হুজুগ তুললেন, চল এখন চারিদিকে শান্তি। এই সময় কোথাও বেড়িয়ে আসি। কাছাকাছি কোথাও নয়। একেবারে কাশ্মীর। প্লেনে কলকাতা থেকে দিল্লী। তারপর দিল্লী থেকে প্লেন পাল্টে জম্মু। উধমপুরে রুক্মিণীর মাসির বাড়ি। সেখানেই যাওয়া হবে আগে। গোছগাছ সেরে বাড়ি থেকে রওনা দিলেন বাবা, মা, রুক্মিণী ও তার দাদা। রুক্মিণীর বয়েস ধরে নাও বছর সাতেক। দাদা এই দশ এগারো। কলকাতার বাড়িতে রয়ে গেলেন দাদু, ঠাকুমা, কাকা-কাকিমা, এক খুড়তুতো বোন আর একটা ধবধবে সাদা কাকাতুয়া, যে রুক্মিণীকে দেখলেই ডাকত, 'রুকু আয়।'"

- "বাঃ, গল্পটা জমে উঠেছে।"

- "জম্মু এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই চমক। রুক্মিণীর মাসি আর মেসো, নিজের দুই ছেলে-মেয়ে ও একটি স্থানীয় কাজের লোককে নিয়ে গাড়িসহ হাজির। ওখান থেকে ৫৩ কিলোমিটার উধমপুর। দেড়ঘণ্টার পথ। মেসো বললেন, "ঘণ্টাখানেক বাদে রাস্তায় একটা খুব ভাল খাবারের হোটেল পড়বে। ওখানেই দুপুরের লাঞ্চ ব্রেক হবে।"

গাড়িতে স্থানীয় ড্রাইভার, মাঝে রুক্মিণীর দাদা, তার পাশে মেসো। পিছনের সিটে রুক্মিণী আর ওর মাসতুতো বোন, দু'ধারে মা আর মাসি। তারও পিছনে যেখানে সুটকেস রয়েছে, তার দু'পাশে মুখোমুখি দু'টো সিট, একটাতে রুক্মিণীর বাবা, আরেকটাতে কাজের লোকটি ও তার কোলে রুক্মিণীর মাসতুতো ভাই। গল্প করতে করতে ঘণ্টাখানেকের পথ পেরিয়ে গেল। দুপুরের খাওয়ার পর গাড়িতে উঠতেই রুক্মিণীর নাকে একটা হাল্কা মিষ্টি গন্ধ এল। রুক্মিণীর মেসো ড্রাইভারকে স্থানীয় ভাষায় কি একটা বকুনি দিলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রুক্মিণীর বাবাকে বাংলায় বললেন, "বুঝেছেন দাদা, একটু সুযোগ পেতেই কোথাও গিয়ে টেনে এসেছে। এইজন্য এদের হাতে কোন পয়সা থাকে না।" রুক্মিণী 'টেনে আসা' ও তার সাথে পয়সার সম্বন্ধ কি বুঝল না, তবে মা ও মাসিকে মুখ টিপে হাসতে দেখে বুঝল এটা বড়দের ব্যাপার, এসব কথায় কান দিতে নেই।

এবারে গাড়ি ছুটতে শুরু করলেও মাঝে মাঝেই যেন ডানদিকে বাঁদিকে দুলতে লাগল। মেসো আবার ড্রাইভারকে বকুনি দিলেন, পিছন ফিরে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন, "প্রায় এসে গেছি।" পাহাড়ি রাস্তা। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ, সঙ্গে ঝাঁকুনি। আর কিছু রুক্মিণীর মনে নেই।"

- "কী সর্বনাশ! গাড়ির এক্সিডেন্ট?"

- "হ্যাঁ, যখন জ্ঞান ফিরল, রুক্মিণী তখন হাসপাতালে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। আস্তে আস্তে সব জানতে পারল। গাড়িটি একটি পাথরে ধাক্কা খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়েছে। বাবা, মা, মাসি, ড্রাইভার স্পট ডেড। মেসো, মাসতুতো বোন, রুক্মিণী ও ওর দাদা ভীষণ রকম জখম। একমাত্র কাজের লোকটি মাসতুতো ভাইকে কোলে নিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ায় দুজনাই প্রায় অক্ষত। দিল্লীর এক হাসপাতালে ওদের অনেকদিন চিকিৎসা চলল। মাসতুতো বোন চিকিৎসায় সাড়া দিলেও কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষে একদিন, ওর জন্মদিনের দিন, হাসপাতালের নার্সরা কেক নিয়ে এসে মোমবাতি জ্বালাতে ওর মুখ দিয়ে আর্তনাদ বের হল, 'মা।' তারপর অনেক চিকিৎসায় কথা বলা শুরু করল। তাও স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছিল।"

- "সত্যিই ভীষণ মর্মান্তিক! আচ্ছা, গল্পটা কি এক্সিডেন্ট দিয়ে শুরু হবে, না কিছুটা গল্প এগোনোর পর ফ্ল্যাশ ব্যাকে?"

- "সেটা তোমার যা ভালো মনে হবে লিখবে। তবে আসল গল্পের শুরু এর পরে। রুক্মিণী ও ওর দাদা অনেকটা সুস্থ হয়ে কলকাতায় ওর মামার বাড়িতে এল। আস্তে আস্তে সব কিছু আগের মত হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। ওদের স্কুলের অনেকগুলো দিন নষ্ট হয়েছে। রুক্মিণী আগে নাচের ও গানের স্কুলেও যেত। সেখানেও অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

কিন্তু বাধ সাধলেন রুক্মিণীর কাকা। উনি মাঝে মাঝেই খোঁজ নিতে আসতেন। শেষে জোরাজুরি। আমাদের বংশের ছেলেমেয়ে কেন মামার বাড়িতে মানুষ হবে? একদিন তো কাকার সাথে এক মামার হাতাহাতি। পাঞ্জাবি ছিঁড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। রুক্মিণী ভাবত কাকা কী ভাল, ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্য মারামারি পর্যন্ত করছেন। ভুল ভাঙল কাকার সাথে ওদের পৈত্রিক বাড়িতে এসে। ততদিনে দাদু পরপারে চলে গেছেন। ঠাকুমা শয্যাশায়ী। কাকা পরিষ্কার জানালেন তিনি চাকরি করে রোজগার করছেন। কাকিমা সংসারের কাজ করেন। রুক্মিণী ও ওর দাদার শুধু অন্নধ্বংস করলেই হবে না। রুক্মিণীর মা বেঁচে থাকলে শাশুড়ির যে সেবা করতেন সেটা রুক্মিণীকেই করতে হবে। বাড়ির কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হল। ঘর মোছা, জামা কাপড় কাচা থেকে শয্যাশায়ী ঠাকুমার সব কিছু করার দায়িত্ব পড়ল ওই সাত বছরের রুক্মিণীর উপর। স্কুল, গানের স্কুল, নাচের স্কুল সব বন্ধ। ভর্তি করা হল পাড়ার কর্পোরেশন স্কুলে। রুক্মিণীর দাদার ভাগ্যে জুটল বাড়ির ফাইফরমায়েশ খাটা ও পাড়ার কর্পোরেশন স্কুলে যাওয়া। সাথে বকুনি তো আছেই।"

- "এ তো সৎ মায়ের থেকেও খারাপ।"

- "মজার কথা কি জানো, রুক্মিণীর কাকিমা কিন্তু খারাপ ছিলেন না। কাকার ভয়ে চুপ করে থাকতেন। মাঝে মাঝে কাকা এসে ঠাকুমাকে দিয়ে কীসব কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যেতেন। রুক্মিণীকেই ঠাকুমাকে বিছানার উপর ধরে বসাতে হ'ত। হাত দিয়ে সাহায্য করতে হ'ত সই করায়। যিনি সই করলেন ও যে শিশুটি তাঁকে সাহায্য করল, কেউই জানতে পারল না কিসে সই করা হচ্ছে। বড় হয়ে রুক্মিণী বুঝেছিল যে সেগুলো ছিল তার বাবার অফিসের পাওনাগণ্ডার কাগজ। রুক্মিণী ও তার দাদার দেখাশোনার নাম করে কাকা সব টাকা আত্মসাৎ করেন। বাবার হোমিওপ্যাথি চেম্বারের মালিকানা, যা ছিল রুক্মিণীর দাদুর নামে, সেটাও কাকা দখল করে বিক্রি করে দেন।"

- "ম্যাডাম, শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এই রুক্মিণী কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়। আপনার পরিচিত কেউ?"

- "বাস্তব বলে মনে হচ্ছে? ভালোই তো, ঠিক ভাবে করলে দর্শকদেরও তাই মনে হবে," বিদিশা দেবী আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

- "মনের দুঃখে অনেক সময় রুক্মিণী ভেবেছে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কোন রেল লাইনে গলা দেয়। কিংবা হাওড়ার ব্রিজের উপর থেকে দেয় গঙ্গায় ঝাঁপ। স্কুল যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একথা ভেবেওছে কতবার, কিন্তু তক্ষুনি কাকাতুয়াটা ডেকে উঠেছে, "রুকু আয়।" মনে হচ্ছিল কাকাতুয়ার মুখে মায়ের গলা। আত্মহত্যার কথা আর ভাবতে পারেনি। আচ্ছা সিনেমায় কথাবলা কাকাতুয়া দেখানো যাবে তো?"

- "ম্যাডাম, আপনাদের সময় থেকে সিনেমার টেকনলজি অনেক পালটে গেছে। এখন সারা সিনেমার চরিত্রদের কথাবার্তাই ডাব করে দেওয়া যায়, কাকাতুয়ার গলার আওয়াজ তো কিছুই নয়।"

- "গল্পে ফিরে আসি। আসলে রুক্মিণীকে সবচেয়ে যন্ত্রণা দিত ওর খুড়তুতো বোন; কি নাম দেওয়া যায়, আচ্ছা ধরে নাও - লতা।"

- "নামটা একটু সেকেলে হয়ে যাচ্ছে।"

- "তা হোক। জানো তো, আগেকার দিনে গ্রামেগঞ্জে সন্ধ্যের পর সাপকে কেউ 'সাপ' বলত না, বলত 'লতা'। এই লতা ছিল ওইরকম সাপের মত সাঙ্ঘাতিক। এখন ওই নামটাই থাক। পরে পছন্দমত বদলে দিও। তা সেই লতা রুক্মিণীর থেকে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। রুক্মিণীকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। পড়ার বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিত। একদিন রান্নাঘরে রুক্মিণী সবার জন্য চা বানাচ্ছে, লতা ঢুকে এমন ধাক্কা দিল যে ফুটন্ত জল সস্প্যান থেকে রুক্মিণীর গায়ে গিয়ে পড়ল। রুক্মিণীর চিৎকার শুনে কাকা এসে সব দেখে লতাকে কিছু না বলে রুক্মিণীর পিঠেই দু ঘা দিলেন, চায়ের জল নষ্ট করার জন্য।"

- "এ তো চাইল্ড অ্যাবিউজ, এখনকার দিন হলে কাকার জেল হয়ে যেত।"

- "তা হয়ত যেত। রুক্মিণী ও ওর দাদা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে তাই নিয়ে অন্য আত্মীয়দের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আসলে বোধ হয় ওদের কাকার কাছে অপমানিত হওয়ার ভয়ে কেউ আসত না। প্রথম প্রথম পুজোর আগে মামার বাড়ি থেকে কেউ না কেউ আসতেন ওদের দুই ভাইবোনের নতুন জামা নিয়ে। কাকা তাঁদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিতেন না। সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলে জামা কাপড় দিয়ে তাঁরা বিদায় হতেন। তবে সেই নতুন জামা রুক্মিণীর কোনদিন পরা হত না। সকালে পাওয়া জামা বিকেলের মধ্যেই কেউ কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিত। বুঝতে পারত এটা লতার কাজ। একটু বড় হয়ে রুক্মিণী মামাদের পুজোয় নতুন জামা দিতে বারণ করে দিয়েছিল।"

- "ভাবছি লতার চরিত্রটা কে করবে?"

- "তখন রুক্মিণী বোধহয় ক্লাস এইটে। ঠাকুমা অনেকদিন মারা গেছেন। পাড়ার এক ক্লাবে রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়েই ছোট ছোট প্রোগ্রাম। পাড়ার সত্যদা দারুণ গাইতেন, একদম হেমন্তর মত গলা। ঠিক হয়েছিল সত্যদা 'মন নিয়ে' সিনেমার 'ওগো কাজল নয়না হরিণী' গানটা গাইবেন। পাড়ার মিতালিদি তার সাথে নাচ করতে পারে এমন কোন ছোটমেয়ে খুঁজছেন। একদিন এলেন রুক্মিণীর কাকার বাড়িতে। মিতালিদি একটু দেখিয়ে দিলেন। তারপর নিজেই গান গাইলেন, সাথে রুক্মিণী ও লতাকে নাচতে বললেন। কাকা বাড়িতে ছিলেন। এসে বললেন, 'লতা নাচতে পারে কিন্তু রুক্মিণী নয়।' ওর বাড়িতে অনেক কাজ আছে। মিতালিদি 'পরে জানাব' বলে চলে গেলেন। একদিন রুক্মিণী স্কুল থেকে ফিরছে, মিতালিদি রাস্তায় ধরে বললেন, 'তোকেই নাচতে হবে। কিচ্ছু ভাবিস না। আমি সব ম্যানেজ করব। তোর কাকাকে বলব আমার বাবা, রিটায়ার্ড স্কুলটিচার, পাড়ার বাচ্চাদের বিনা পয়সায় অঙ্ক শেখাবেন রোজ বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টা। সেই সময় তুই আমাদের বাড়ি এসে রিহার্সাল দিবি।

সময় তুই আমাদের বাড়ি এসে রিহার্সাল দিবি। তুই, আমি, আর সত্যদা ছাড়া কেউ জানবে না। তোর প্রোগ্রামও ওই সময় হবে। তোর মুখে মাস্ক থাকবে। কেউ বুঝতে পারবে না।’ সেইরকমই কাজ হল। কাকা প্রথমে একটু আপত্তি করলেও শেষে রাজী হলেন বিনা পয়সায় কোচিং শুনে। আর পড়াশোনার ব্যাপার বলে লতাও যাবার জন্য জেদ ধরল না। বোধহয় ভাবল বেশ হয়েছে, বিকেলে সবাই যখন খেলে, তখন রুক্মিণী ঘরে বসে অঙ্ক করবে। তবে কাকা বলে দিলেন সন্ধ্যে ছ’টার মধ্যে বাড়ি ঢুকতে হবে, নাহলে রুক্মিণীর কপালে দুঃখ আছে।”

- “যাক, তাহলে স্কুলের বাইরে রুক্মিণী কোথাও যাওয়ার অনুমতি পেল। আচ্ছা, গল্পে এই বয়সে কোন রোম্যান্টিকতার ছোঁয়া আনা যায়না?”

- “আসছে, আসছে, ধৈর্য ধর। রিহার্সাল চলতে লাগল। মিতালিদি একদিন রুক্মিণীর প্রোগ্রামের কস্টিউম কিনে আনলেন, জুতো, ফ্রক, মাস্ক। রুক্মিণী ভয়ে ভয়ে বলল, ‘এগুলো তোমার কাছেই রেখে দিও, বাড়িতে নিয়ে গেলেই ধরা পড়ে যাব।’ প্রোগ্রামের দিন ঠিক বিকেল পাঁচটায় রুক্মিণী গেল মিতালিদির বাড়ি। প্রোগ্রাম তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। কাকিমা লতাকে নিয়ে অনেকক্ষণ চলে এসেছেন। কাকা বাড়িতে। মিতালিদি দ্রুত তৈরি করে রুক্মিণীকে নিয়ে হলে এসে গেলেন। রুক্মিণী গ্রীনরুমে বসে খালি দেওয়াল ঘড়িটা দেখছে, মুখে মাস্ক। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা, তখনো ওর ডাক আসেনি। অবশেষে এল। গানের সাথে নাচতে নাচতেই দেখল দ্বিতীয়সারিতে কাকিমা বসে আছেন, পাশে লতা। আশাকরি ওঁরা বুঝতে পারছেন না কে নাচছে। চোখ গেল উইংসের

পাশ থেকে লাইট ফোকাস করা শৌর্যের দিকে। পাড়ার ছেলে, রুক্মিণীর দাদার বয়সী। লাইট ফোকাস করবে কি, হাঁ করে রুক্মিণীকে দেখছে। গান শেষ হতেই হাততালির ঝড়ের মধ্যে কোন রকমে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে রুক্মিণী চলে গেল গ্রীনরুমে। ঘড়িতে ছ’টা বাজতে দশ। কোনরকমে ড্রেস পালটে রুক্মিণী গ্রীনরুমের পিছনের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে দৌড়ল বাড়ির দিকে। হলে তখন গুঞ্জন উঠল, ‘মেয়েটা কে রে? এত ভাল নাচল, বোধহয় কোন বাইরের প্রফেশনাল ড্যান্সার, ভাড়া করে নিয়ে এসেছে।’ হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি পৌঁছে রুক্মিণীর খেয়াল হল তাড়াহুড়োয় পায়ে একপাটি নিজের চটি ও আরেক পায়ে নাচের জুতো পড়ে চলে এসেছে। এখন কি হবে? ওর আর কোন চটি নেই। খালি পায়েই স্কুলে যেতে হবে। তাছাড়া জুতোর দু’পাটি তো মিতালিদিকে ফেরত দিতে হবে। ভাগ্যিস তখন স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। তবে স্কুল খুললে কাকা তো জানতেই পারবেন। তখন কি হবে? ভাবনায় রুক্মিণীর রাতে ঘুম হয় না।

হঠাৎ একদিন গরমের দুপুরে দরজায় কে আস্তে কড়া নাড়ল। কাকা অফিসে। কাকিমা ও লতা ঘুমোচ্ছে। দেখে শৌর্য। হাতে একটা থলি। রুক্মিণীকে দেখেই 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ' নাটকের গানের সুরে গেয়ে উঠল, 'নতুন জুতো পালটে, পুরনো জুতো নেবে কে?' থলি থেকে বার করল রুক্মিণীর এক পাটি চটি ও নতুন জুতোর এক পাটি। রুক্মিণী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে নাচের জুতোর আরেক পাটি দিয়ে বলল, 'মিতালিদিকে দিয়ে দিও।' শৌর্য বলল, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল তুমিই সেই মেয়ে। কতগুলো বাড়ি ঘুরে এখানে এলাম জানো?'

গরমের ছুটির পর স্কুল খুললে শৌর্যর সাথে প্রায়ই রাস্তায় দেখা হত। ছোটবেলার এক্সিডেন্ট থেকে কাকার বাড়ির সব কথাই ওকে রুক্মিণী বলেছে। মাধ্যমিকে, তারপর উচ্চ মাধ্যমিকে, শৌর্য ওকে অনেক সাহায্য করেছে নোটস দিয়ে। কলেজে জিওগ্রাফি অনার্স নিয়ে রুক্মিণী ভর্তি হল। ওর দাদা তখন বি এস সি পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছে। একদিন কলেজে আফ্রিকার ম্যাপের মডেল তৈরি করতে হবে। রুক্মিণীর আঁকার হাত খুব ভাল। কয়েকদিন খেটে ম্যাপ এঁকে, রঙ করে সেখানে ছোট ছোট পুতুল, যে জায়গায় যে সব ফসল হয়, সেখানে তার ছোট ছোট প্রতিকৃতি বসিয়ে কাজ শেষ করে রুক্মিণী স্নান করতে গেছে। পরের দিন সকালে কলেজে জমা দিতে হবে। স্নান করে এসে দেখে পুরো ম্যাপ টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া। লতার কাজ। আজ রুক্মিণী কাঁদল না। সারা রাত জেগে আবার মডেল বানাল। সকালে কলেজ যাওয়ার আগে দাদাকে বলে গেল, 'একটা ভাড়াবাড়ি দেখ, এখানে আর নয়।' তাই হল। ওরা অন্য জায়গায় উঠে গেল। শৌর্যের সাথে যোগাযোগ ছিল। ওর কাছ থেকেই একদিন খবর পেল কাকিমা মারা গেছেন। তার কিছুদিন পর শুনল কাকা স্ট্রোক হয়ে প্যারালাইসড্, বাড়িতে শয্যাশায়ী। রুক্মিণী গিয়েছিল দেখা করতে। লতা দরজা খুলে ওকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। আর সামনে এল না। কাকা বিছানায় শুয়ে। রুক্মিণীকে দেখে ওনার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। কথা বলতে পারছিলেন না। হয়ত নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছিল। রুক্মিণী চলে এসেছিল। আর ও'বাড়িতে যায়নি।"

- "লতার সাথে আর দেখা হয় নি?"

- "হয়েছিল। অনেক পরে। রুক্মিণী ও শৌর্য তখন বিয়ে করে নিজেদের বাড়ি কিনেছে। দুজনাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কোথা থেকে ফোন নম্বর জোগাড় করে লতা ফোন করেছিল। ও বিয়ে করেছে, একমাত্র ছেলে অটিস্টিক। চিকিৎসার প্রচুর খরচ। রুক্মিণী যদি কিছু সাহায্য করে। মজার কথা, নিজের এতদিনের ব্যবহার নিয়ে কোন অনুশোচনা নেই। রুক্মিণী ঠিক করেছিল কী করবে। ফোনে ওর ছেলের সব খোঁজ খবর নিয়ে পরদিন দুপুর দুটোয় ওকে বাড়িতে আসতে বলেছিল। সেই গরমে ট্রামে বাসে লতা এসেছিল। রুক্মিণী দেখা করে নি। কাজের লোককে দিয়ে একগ্লাস জল পাঠিয়ে এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখে জানিয়েছিল এখন ব্যস্ত, অন্যদিন আসতে। লতা সেই যে চলে গেছে, আর আসে নি। গল্পও এখানেই শেষ।"

- "বাঃ, চমৎকার। আজ উঠি। স্ক্রিপ্ট তৈরি হলে আপনাকে জানাব।"

রিমঝিম উঠে রওনা দিল। বিদিশা দেবী দোতলার জানালা থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, রিমঝিম গাড়িতে উঠছে। এই জানালা দিয়েই একদিন পর্দার আড়াল থেকে দেখছিলেন, তাঁর খুড়তুতো বোন, লতা নয়, বিশাখা, রেগে অপমানিত হয়ে রাস্তায় বেরল। একটু হেঁটে গিয়ে ফিরে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি বলল, বোধহয় অভিশাপ দিল। তারপর হনহন করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। না, গল্পের শেষটা রিমঝিমকে বলেন নি।পরিচিত এক এন জি ও'কে বলে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বিশাখার ছেলের চিকিৎসার সব খরচ দিয়ে গেছেন। এখনও দিয়ে চলেছেন। বিশাখা জানে না। বিদিশা দেবীর কথা ভাবলেই বোধহয় রাগে জ্বলে ওঠে। জ্বলুক। এটাই ওর শাস্তি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অভিরূপা বসু (দিল্লি)

প্যাসিফিক মহাসাগরে সূর্যাস্ত: সোম গাঙ্গুলী

আত্মিক

অর্পিতা মিত্র

১। সৎসঙ্গ

অনির্বান সদ্য কেনা এসইউভিটা রাস্তার ধারে পার্ক করলো। পার্কিংয়ের ছেলেটা দৌড়ে এলো সাহায্য করবে বলে, কিন্তু অনির্বান একটু বিরক্তই হলো তার আসতে কিছুটা দেরি হওয়ায়। এরা গাইড করে দিলে একটু সুবিধা হয়, এই আর কি। এমনিতেই ড্রাইভার একটা ফালতু কারণে কদিন ছুটি নিয়েছে বলে মেজাজ বিগড়ে আছে। কলকাতার রাস্তায় আজকাল গাড়ি চালানো মানেই মেজাজ আর ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া। গাড়ি থেকে নেমে পার্কিং টিকিটটার সাথে নিজের ঘড়ির সময়টা মিলিয়ে নিতে ভুললনা। একটু অসাবধান হলেই লোকে ঠকাবার জন্য ব্যস্ত। আর সহজে ঠকে যাবার মানুষ অনির্বান নয়।

ঘড়িতে তাকিয়ে অনির্বান দেখলো নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই সে চলে এসেছে। আসলে বেশ কয়েক মাস অনির্বান একটা সৎসঙ্গে জয়েন করেছে। মাসে একদিন ব্যস্ত সিডিউলের মাঝে সময় বার করে আসার চেষ্টা করে। ছেলে মেয়েরা প্রতিষ্ঠিত। সহেলী আর সে আজকাল আর একসাথে থাকেনা। একে অপরকে স্পেস দিতেই তারা পছন্দ করে। এই নতুন অ্যারেঞ্জমেন্টে তারা তাদের মতো করে জীবনকে উপভোগ করছে। অনির্বানও নিজের জীবনকে ব্যস্ত রাখার সব চেষ্টা করে। ফালতু সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতি সে কোনোকালেই ছিলোনা। হাতে কিছুটা সময় থাকায় ফুটপাতের খানাখন্দ পেরিয়ে একটু সাবধানেই হাঁটছিলো অনির্বান। হঠাৎ পিঠে একটা হালকা চাপড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সামনে অলোক। কলেজ জীবনের পর এই প্রথম দেখা হলেও চেহারাটার খুব একটা বদল হয়নি অলোকের। তবে এতদিন পরে দেখা হলেও চিনতে পারার আসল কারণ অলোকের সেই উজ্জ্বল হাসি। ছোটোখাটো চেহারা আর ঝকঝকে চোখ নিয়ে অলোক ছিল সবার খুব প্রিয়। আর সব থেকে বড় কথা অলোকের ভালোমানুষির জন্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সে যাতে ঠকে না যায় তাই প্রত্যেকে তাকে সামলাতে ব্যস্ত থাকতো। ফুটপাতের ভীড় এড়িয়ে দুজনে রাস্তার ধারের একপাশে এসে দাঁড়ালো। অলোক একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করলো, "তুই পায়ে হেঁটে কোথায় চলেছিস?"

বেশ একটু বিজ্ঞের মতোই বললো অনির্বান, “অনেক তো হলো, এবার একটু পরপারের কাজ করার চেষ্টায় চলেছি রে।”

অলোক বললো, “বাবা, সে তো খুব শক্ত কাজ। আমার ওসব আসে না, তবে তোরা প্রতিভাবান। তোদের দ্বারা হবে। চালিয়ে যা ভাই, কাউকে তো হাত লাগাতে হবে কিছু ভালো হবার জন্য।”

অনির্বান আরও উৎসাহের সাথে বললো, "আরে, প্রতিভা আবার কি? নিজের ভালো লাগাটাই আসল কথা। তুই জয়েন করবি? আমার হোল্ড আছে।"

অলোক একটু থতমত খেয়ে বললো, "না বাবা, আমি আমার ষড় রিপু নিয়ে বেশ আছি। ও আমার সাথেই থাকে। ওসব আমি জলাঞ্জলি দিতে পারবো না।"

"তুই আজও একই আছিস। এখনো কি লোকে তোকে ঠকিয়ে নেয়?" একটু অবজ্ঞার সাথে বললো অনির্বান।

অলোক হোহো করে হেসে বললো, "কিছু কি পাল্টায় রে? দুজনকে ওই কিছু ধার দিয়েছি। ফেরতই দিচ্ছেনা"

"আজকালকার দিনে কেউ ধার দেয়? বুঝতে পারিস নি?" অনির্বানের গলায় বিরক্তি স্পষ্ট।

অলোক স্মিত হেসে বললো, "জানতাম ফেরত দেবেনা। প্রথমবার তো নয়। বললো মায়ের অসুখ। হাতে টাকা ছিল। ভাবলাম দিয়েই দি। মনে করলাম আমার মাকেই না হয় দিলাম।"

অনির্বান জিজ্ঞাসা করলো, "কী করিস আজকাল? মা বোন কেমন আছে?"

কলেজে থাকাকালীনই বন্ধুরা জানতো অলোকের বোন তথাকথিত স্বাভাবিক মস্তিষ্কের নয়। তার বেড়ে ওঠার গতি একটু ধীর। বাবা ছিলোনা। মা দুই সন্তানকে বড় করেছেন নিজেই।

অলোক একটু ম্লান হেসে বললো, "মা চলে গেছেন কয়েকবছর হলো। এখন বাড়িতে বোন আর আমি। জ্যান্ত দুর্গা নিয়ে আমার বাস। তার প্রতিটা কাজ আমাকেই করতে হয়। ঈশ্বর আমাকে এতো বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, আমার থেকে ভাগ্যবান আর কে আছে বল। আমি এখন চলি রে। ওদিকে পাড়ায় আবার বেশ কিছু পোষ্য বসে আছে বিস্কুট খাবে বলে। ফুরিয়ে গেছে, তাই কিনতে এসেছিলাম। তুই এগো। তোর সৎসঙ্গের বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলি আমি।"

অলোক পলকে হনহন করে গলির বাঁকে মিশে গেলো। অনির্বান কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো এক তৃপ্তির হাসি। হয়তো প্রথমবার এক অপার্থিব ভালো লাগায় মনটা ভরে গেলো এই ভেবে যে অলোক তার ছেলেবেলার বন্ধু। ধীর পায়ে সামনের লেকের দিকে হাঁটার জন্য পা বাড়ালো অনির্বান। এতো বড় সৎসঙ্গের পর আর চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বাঁধতে ইচ্ছা করলো না অনির্বানের।

২। অপরিবর্তন

রবিবারের সকালটা সবসময়ই খুব প্রিয় ঝিলিকের। সারা সপ্তাহ অফিসের পর আজ ঝিলিকের ছুটির দিন। ছোট ফ্ল্যাটবাড়ির এই একটুকরো বারান্দাটায় সকালের মিঠে রোদ খেলা করে বেড়ায়। দেখতে দেখতে প্রায় বছর পঁচিশ হয়ে গেলো তারা এই বাড়িতে। মা, বাবা গত হবার পর এখন ঝিলিক আর তার ছোটবোনের সংসার। এক সময়ে সারা শহর

দাপিয়ে বেড়ানো ছোটবোন আজ এই বাড়িটাকেই নিজের পৃথিবী করে নিয়েছে। আর সেই পৃথিবীর একমাত্র সূর্য তার দিদি। একটা ভয়ঙ্কর একসিডেন্টে তিয়াসের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অকেজো। কিছুদিন আগেও গমগম করা সেই বাড়িটা আজ একটু বেশিই নির্জন।

কদিন ধরেই মনটা উদাস ঝিলিকের। হাতের মুঠোফোনটা নাড়াচাড়া করতে করতে হোয়াটস্যাপে বিতানের ফোন নম্বরটা বার করে সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ঝিলিক। কলেজ শেষ হবার পর বিতানের সাথে সমস্ত যোগাযোগ সে নিজের হাতেই নষ্ট করেছে। নিজের অফিস আর তিয়াসকে সুস্থ করা ছাড়া আর কোনো আকর্ষণই ছিলোনা জীবনে। নিজের কর্তব্যকে প্রাধান্য দেবার জন্য সে হয়তো অন্যায়ই করেছিল বিতানের সাথে। আর আজ এত বছর পরে এতো সকালে বিতানকে কল করা কি ঠিক হবে? উথালপাথাল মনটাকে আজ আর বসে আনার চেষ্টা না করে সায় দিতে ইচ্ছা করলো ঝিলিকের।

দু'একটা রিং এর পরেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো সেই পরিচিত কণ্ঠ। মুহূর্তে সব দূরত্ব মুছে গেলো। লেকের ধারে ঘন সবুজের সুদীর্ঘ পথ তারা পেরোলো একসাথে, আবার, প্রতিবারের মতো। নীরবতা ছিল তাদের সঙ্গী। আঙুলের উত্তাপ সৃষ্টি করছিলো সুরের মাধুরী। চলার ছন্দ ফুটিয়ে তুলছিলো এক একটা ব্রহ্মকমল। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ আলিঙ্গন করছিলো একে অপরকে। কী পবিত্র, কী মাধুর্যে ভরা তাদের সম্পর্ক। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, দূরত্ব নেই, পরিবর্তন নেই। আছে শুধু নিখাদ ভালোবাসা।

চমক ভাঙলো হুইলচেয়ারে বসা প্রতিবন্ধী ছোটবোন তিয়াসের গলায়। ঘুম থেকে উঠে কখন চুপ করে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দিদির হাতের ওপর আলতো করে হাত রেখে তিয়াস জিজ্ঞাসা করলো, "চুপ করে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিস দিদি?"

সম্বিৎ ফিরে পেলো ঝিলিক। দুচোখের স্বপ্নটাকে আবার সোনালী বাক্সে মুড়িয়ে রেখে ছোটবোনকে জড়িয়ে ধরে ঝিলিক বললো, "কিছু না সোনা, আজ দুপুরে কি খাবি বল?"

৩। উপহার

সকাল থেকে নীল কালির সৌখিন বল পয়েন্ট পেনটা খুঁজে পাচ্ছেনা তিতির। কলেজের ব্যাগ, টেবিলের ড্রয়ার, বইয়ের র‍্যাক সব তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও না পেয়ে বিরক্ত মুখে গটগট করে কলেজ বেরিয়ে গেলো। অবিকল একই রকমের দুটো পেন কিনে একটা নিজের জন্য রেখেছিলো, আর অন্যটা উপহার দিয়েছিলো আবিরকে।

আবির তিতিরের সহপাঠী। শুধু সহপাঠী বললে অবশ্য কম বলা হয়, কারণ দীর্ঘ তিন বছর তারা কলেজে প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সমাজে উচ্চবিত্ত ঘরের

মেয়ে তিতিরকে নিজের শখ পূরণের জন্য কোনো বেগ পেতে হয়না। যথেষ্ট পকেট মানি তার বরাদ্দ থাকে। সেই অর্থে আবির কিছুটা অস্বচ্ছল ঘর থেকে আসা। নিজের অনেকটা দায়িত্বই তাকে নিজেকে বহন করতে হয়। তাই কিছুটা অলিখিত ভাবেই তার আর আবিরের মাঝে অনেক কিছুই খরচ করা তিতিরের নিজস্ব অধিকারের মতো হয়ে গেছে। অনেক সময় নিজের জন্য ভালো কিছু কিনলে, আবিরের জন্যও কিছু কিনে নেয় তিতির। এতে আবির খুশী বা অখুশী কোন ভাবই প্রকাশ করে না। জীবনের প্রতি আবিরের এই নির্লিপ্ততা তিতিরকে মুগ্ধ করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তার মনে হয় সে আবিরকে সম্পূর্ণ বুঝতেও পারেনা। কলেজ ক্যান্টিনে তিতিরের ব্যাজার মুখ দেখে আবির বুঝলো কিছু গণ্ডগোল। সব শুনে হো হো করে হেসে বললো, "বোঝো কাণ্ড! কাল তোর থেকে পেনটা নিয়ে তো আমি লিখলাম। তারপর দিতে ভুলে গেছি। আর সেই নিয়ে মহারানীর এতো মেজাজ গরম?" কথাটা বলার পর কাঁধের ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে নীল পেনটা বার করে মোলায়েম গলায় বললো, "এই নে তোর শখের পেন। এবার খুশি তো?"

এতক্ষণে কিছুটা আস্বস্ত হলো তিতির। মনের বিরক্তির কিছুটা আবিরের ওপর ঢেলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে লাইব্রেরি চলে গেলো।

বাড়ি ফিরে একটু তাড়াতাড়ি পড়তে বসলো তিতির। কাল ডিপার্টমেন্টাল ভাইভা। প্রতিবারের মতো টপ করা চাই। ফ্লুইড ডায়নামিক্সের বইটা খুলতেই দেখে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে তার হারিয়ে যাওয়া নীল পেন। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে দেখে সেখানেও উঁকি মারছে সকালে আবিরের দেওয়া নীল পেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলো তিতির। ঘুণাক্ষরে এতটুকু বুঝতে না দিয়ে কতো সহজে নিজের উপহার পাওয়া পেনটাই তিতিরকে দিয়ে দিয়েছে আবির।

প্রতিদান

বুলা চ্যাটার্জি

অনেকক্ষণ ধরে বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দু'টো যেন দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। একটা বসার জায়গা পেয়ে ভীষণ খুশী হল জয়িতা। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা কোলে নিয়ে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আর মাত্র তিনটি স্থানে থেমে বাসটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। একবার আড়চোখে ঘড়িটা দেখে নিল জয়িতা — হাতে এখনও অনেকটা সময় রয়েছে। প্রথম ঘণ্টায় ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে পারবে — অধ্যাপকদের বাঁকা মন্তব্য শুনতে হবে না।

অন্যমনস্ক জয়িতা চমকে উঠল কণ্ডাক্টারের গলার স্বরে। তাড়াতাড়ি সে তাকায়। তাড়াতাড়ি সে তার ঝোলা ব্যাগে হাত ঢোকালো। কোথায় গেল তার পয়সা রাখার ছোট্ট বটুয়া — বইখাতা, কলম, মশলার কৌটো সব কিছু উল্টে পাল্টে দেখল — নাঃ, কোথাও নেই তার সেই বটুয়া। করুণ চোখে লজ্জিত মুখে জয়িতা ধরা গলায় বলে উঠল – " আমি — আমি খুঁজে পাচ্ছি না।" বাসের কণ্ডাক্টার লক্ষ্য করছিল জয়িতার ব্যাগ হাতড়ানোর ব্যাপারটা। কিছু না বলে অন্য যাত্রীর দিকে মন দিল।

চিন্তিত মুখে জয়িতা নেমে পড়ল বাস থেকে। আরেকটা বাসে তাকে উঠতে হবে। বাস ভাড়া না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে, সে যাতে ধরা না পড়ে। নানা রকমের দুশ্চিন্তা নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একজন পুরুষ কণ্ঠ তার পেছন থেকে বলে উঠল, "আচ্ছা আপনাকে একটা কথা বলছি; যদি কিছু মনে না করেন।"

জয়িতা ঘুরে তাকাল একজন চোখ কোটরগত, শীর্ণ চেহারার কালো ভদ্রলোকের পানে। একটু কুণ্ঠিত গলায় ভদ্রলোক বলে উঠল, "আপনাকে আমি চিনি — 3A বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে আপনি রোজ সকালে বাসে ওঠেন তো?" বিরক্ত বোধ করে জয়িতা। একে তো পকেটমার হয়েছে। তার উপরে এই ভদ্রলোক! যাইহোক, জয়িতা তার আয়ত, ঈষৎ বাদামী চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠল, "হ্যাঁ।" ভদ্রলোক ততক্ষণে তার পকেট থেকে কয়েকটা টাকার নোট বার করে বলল, "আপনি এই টাকাগুলো রাখুন, আমাকে অন্য কোন দিন ফেরত দিলেই হবে।" জয়িতা একটু ইতঃস্তত করে টাকাটা হাতে নিতে গিয়ে বলল, "আমার দু'টাকা হলেই চলবে।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত খুশী হয়ে বলে চলল, “আমার বাড়ীর ঠিকানা হচ্ছে.....। আমি অফিস থেকে সন্ধ্যে ছ’টায় ফিরি। আমার মা, বোনকে ফেরৎ দিলেই হবে।” একটু ঢোঁক গিলে নিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠল, “আমরা একই কমপ্লেক্সে থাকি, এই আর কি, মানে ...।” জয়িতা হাতে শেষ পর্যন্ত দুটো টাকা নিয়ে দ্রুতপদে রাস্তা পার হ’য়ে যায়।

বেশ কয়েকমাস কেটে গেল, জয়িতার জীবন তার নিজস্ব কর্মধারায় চলতে শুরু করল। সে এখন আর 3A বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে থাকে না। একদিন সে তার সেজকাকুর বাড়ি বাগুইহাটিতে যাবার বাসে জানলার ধারে দরজার পাশেই বসে রয়েছে, একজন ভদ্রলোক দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু কাগজপত্রসহ একটা অফিসের ছোট ব্যাগ ধরতে অনুরোধ করল। জয়িতা হাত বাড়িয়ে নিল। সে ভ্রুক্ষেপই করল না, আর ভদ্রলোকের দিকে তাকানোর কোন প্রয়োজনবোধও হয়নি তার। মিনিট দশেক পরে সেই ক্লান্ত, শ্রান্ত কালোফ্রেমের চশমাপরা চেহারার হারগিলে এক ভদ্রলোক লোকজন ঠেলেঠুলে তার সামনে এসে দাঁড়াল। জয়িতা গম্ভীর ভাবে একবার তাকালো। ভদ্রলোক অতি পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় হেসে অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল।

জয়িতা ভ্রু কুঁচকে একরাশ বিরক্তি নিয়ে কটমট করে ভদ্রলোকের দিকে চাইল — আর চট করে তার কোলে রাখা জিনিসগুলো ভদ্রলোককে ফেরৎ দিয়ে দিল। ভদ্রলোকের কৃষ্ণবর্ণ আরো যেন কালো হয়ে উঠল। লজ্জা, অপমানে ভদ্রলোক কেমন যেন মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না বাস থামে। জয়িতা মনে মনে ভাবল — আশ্চর্য, সুন্দর মেয়েদের দেখে গদগদ হওয়ার সময় কিছু মনে থাকে না। এখন দেখ কেমন চুপসে ম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে — যত সব ...।

এবার জয়িতা ঘাড় ঘুরিয়ে তার সেই চেনা 3A বাস-স্ট্যাণ্ডটার দিকে তাকাল– আরে! এই তো সেই ভদ্রলোক যে তাকে বেশ কিছুদিন আগে দু’টাকা ধার দিয়েছিল — সেই লোকটাই তো তাকে এক পরিচিতির হাসি উপহার দিতে চাইছিল!

❋

যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে, যাকে ‘পুণ্যভূমি’ নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে,.... যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি — এই ভারতবর্ষ।

—(ভারতবর্ষ ও তার পুনরুত্থানের উপায় — স্বামী বিবেকানন্দ)

ভারত আবার জগত-সভায় ...

অশোক নন্দী

আত্মবিশ্বাস ও শক্তিতে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত এক নতুন ভারতকে জানলাম সম্প্রতি। আমাদের ভালোবাসার দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, আরো এগোবে। আমরা আমেরিকায় আসার আগে ভারতের আর্থিক দুরবস্থার সীমা ছিল না। বিদেশী পত্র পত্রিকায় দেশের খবর কিছু থাকত না, ক্রিকেট কিম্বা ফুটবল খেলার নামই জানত না এদেশে কেউ। তরুণ ছেলেরা এসেছিলাম দল বেঁধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জেতা এক অচেনা অজানা বড়লোকের দেশে। এদেশ ছিল নিজ গর্বে উন্মত্ত, সারা বিশ্ব ছিল ওদের কাছে খেলাঘর। ওদের ভাষা ইংরেজি হলেও মনে হত অন্য ভাষা। চকচকে দেশ নিয়ন আলোয় ঝলমলে। তরুণ তরুণীদের চোখে মুখে হাসির ফোয়ারা, স্বাধীনচেতা কথাবার্তা; এক অদ্ভুত তেজ ও দম্ভে নির্ভীক চালচলন। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি পেয়েছিলাম সহজে কিছু পরে; আমাদের ব্যবহার আর কর্মনিষ্ঠায় ওরা হয়েছিল চমৎকৃত। কাজের দেশে এসেছিলাম কাজের খোঁজে। তাই ওরা আমাদের ভালবেসেছিল। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা আকাশে বাতাসে। অর্ধশতাব্দী আগের ভারত সারা দুনিয়ার লাঞ্ছনা, অপমান সয়ে সয়ে এক খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। নুতন ভারতে শিক্ষাদীক্ষা, বাঁচবার আকাঙ্খা এখন প্রবল। আমি অর্ধশতাব্দী বিদেশে থেকে ধীরে ধীরে সেই জাগরণ দেখেছি। সেই উন্নতিতে আমরা সবাই গর্বিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভারতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক তাড়াতাড়ি। আত্মসম্মান বোধ জাগরিত হয়েছে সারা ভারতে। বিদেশের সহজ বাতাস, সুবিধা যেন আমাদের এই নুতন দেশে ছিল এক ক্যাটালিস্ট। সেই চেতনা বুঝি এসেছে পুরানো সভ্যতাবাহী ভারতের জনসমুদ্রে, ওখানে যেন বান ডেকেছে।

নব ভারতে নব সমস্যা। প্রতিটি সভ্যতার উন্নতির সময়কালে অন্যান্য দেশের হিংসাত্মক ব্যবহার শুরু হয়। যেটা বোঝা গেছে বিগত সত্তর বছর ধরে পাকিস্তানের নানা রকম আচরণের মধ্যে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা হল পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসী হামলা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশী আধিপত্য এবং ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ ছায়া অবশেষে সরে যেতে শুরু করেছে। একসময়ের ভাঙা গর্ব এবং খণ্ডিত পরিচয়ের পরিবর্তে ঐক্য, উদ্দেশ্য এবং আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি স্থান পেয়েছে। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক রূপান্তর নয় — এটি একটি সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পুনরুত্থান। জ্ঞান, দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্পে সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতের উত্তরাধিকার, যা একসময় আক্রমণ এবং ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরাবিষ্কৃত এবং পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অশোক ও আকবরের দরবার থেকে যে গৌরব একসময় বিকিরিত হয়েছিল তা এখন ভারতের উদ্ভাবন কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক

পুনরুজ্জীবন এবং বিশ্বব্যাপী কূটনীতিতে আবারও জ্বলজ্বল করছে।

ভারত আর নিজেকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেখে না, বরং বিশ্বে তার ন্যায্য স্থান, একটি উন্নত দেশ বলে মনে করে। এ দেশের সীমানা আরও সুরক্ষিত, এর সশস্ত্র বাহিনী আরও সুসজ্জিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং এর জনগণ আরও চেতনায় ঐক্যবদ্ধ। নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস অহংকার থেকে নয়, বরং স্থিতিস্থাপকতা থেকে আসে, যা সংগ্রাম, ত্যাগ এবং অতীতের গভীর উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত।

আজ ভারত একজন অনুসারী হিসেবে নয়, বরং একজন নেতা হিসেবে এগিয়ে চলেছে — তার ঐতিহ্যের জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত এবং তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে। একসময় জোরপূর্বক মুছে ফেলা গৌরব কেবল স্মরণ করা হচ্ছে না — তা পুনরুদ্ধার, এবং গর্বের সাথে জাতির বৈশিষ্ট হিসেবে ধারণ করা হচ্ছে।

এবারে কিছু সাম্প্রতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা হলো যা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসী হামলা বলে মনে করে:

(১) মে ২০২৫ সালের হামলা: সম্প্রতি (১লা ও ২রা মে) ভারত-শাসিত কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত 'অপারেশন সিন্দুর' নামে পাকিস্তানে বিমান প্রতিআক্রমণ চালায়। ভারত দাবি করে যে এই প্রতিআক্রমণে পাকিস্তানে কমপক্ষে ৭০ জন নিহত হয়েছে, যদিও পাকিস্তান ২৬ জন নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করে। এই ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলাগুলির আদানপ্রদান ঘটে এবং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সংঘাত চলে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের অনুরোধে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, তবে পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগও ওঠে। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতের পোস্ট লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে ভারতীয় সেনাবাহিনী দাবি করে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা, বারামুল্লা, পুঞ্চ, নওশেরা এবং আখনুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

(২) এপ্রিল ২০২৫ সালের পহলগামে হামলা: ২২শে এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে একটি সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। ভারতীয় পুলিশ দুজন সন্দেহভাজনকে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার ঘোষণা করে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হামলা যা পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সমর্থনপ্রাপ্ত বলে অভিযোগ করা হয়:

(১) ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালের পুলওয়ামায় হামলা: ১৪ই ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৪০ জনের বেশি সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (CRPF) জওয়ান নিহত হন। এই হামলার দায় জইশ-ই-মুহাম্মদ (JeM) নামে একটি পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী স্বীকার করে। ভারত এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে বালাকোটে বিমান আক্রমণ চালায়।

(২) ২০১৬ সালের উরিতে হামলা: ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেনা ঘাঁটিতে সন্ত্রাসী হামলায় ১৯ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। এই হামলার দায়ও পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী

জইশ-ই-মুহাম্মদ-এর ওপর চাপানো হয়। ভারত এর জবাবে ২৯ সেপ্টেম্বর 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' পরিচালনা করে বলে দাবি করে।

(৩) নভেম্বর ২০০৮ সালের মুম্বাইয়ে হামলা: ২৬শে থেকে ২৯শে নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে মুম্বাইয়ে পাকিস্তান-ভিত্তিক লস্কর-ই-তৈয়বা (LeT) জঙ্গিদের দ্বারা ধারাবাহিক সন্ত্রাসী হামলায় ১৬৬ জন নিহত হন, যার মধ্যে বিদেশি নাগরিকরাও ছিলেন। এই হামলা ভারতের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে পাকিস্তান বরাবরই ভারতে সন্ত্রাসী হামলায় তাদের সামরিক বাহিনীর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে থাকে এবং প্রায়শই দাবি করে যে তারা নিজেরাই সন্ত্রাসবাদের শিকার। তবে, ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে বারবার প্রমাণ পেশ করে আসছে যে পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ভারতের বিরুদ্ধে হামলা চালানোতে স্বক্রিয় থাকে এবং তাতে প্রায়শই পাকিস্তানি রাষ্ট্রের গভীর থেকে সমর্থন থাকে।

অপারেশন সিন্দুরের প্রতিআক্রমণের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয় যে ভারত পাকিস্তানের কিরানা পাহাড়ের পারমাণবিক স্থাপনা বা বাঙ্কারে আক্রমণ চালিয়েছে, যেখানে টানেলের প্রবেশপথ এবং HVAC ডাক্টের মতো জায়গা দিয়ে বমিংয়ের সুযোগ নেয়া হয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ) অপারেশন সিন্দুরের সময় কিরানা পাহাড়কে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করেছে। ২০২৫ সালের মে মাসের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন, যার মধ্যে ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অফ এয়ার অপারেশনস, এয়ার মার্শাল এ কে ভারতীর বিবৃতিও রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বলে যে ভারত কিরানা পাহাড়ে হামলা চালায়নি। এমনকি তিনি কিরানা পাহাড়ে পারমাণবিক স্থাপনা রয়েছে এমন দাবির সাথে অপরিচিতি প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন, "কিরানা পাহাড়ে কিছু পারমাণবিক স্থাপনা রয়েছে তা আমাদের জানানোর জন্য ধন্যবাদ, আমরা এটি সম্পর্কে জানতাম না। আমরা কিরানা পাহাড়ে আঘাত করিনি।"

কিছু অনলাইন জল্পনা এবং "আগের ও পরের"-এর ছবিগুলি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও, ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স (OSINT) এবং অন্যান্য তদন্তগুলি নিশ্চিত করেছে যে প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু ছিল সারগোধা এয়ারবেস, যা কিরানা পাহাড় থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কিরানা পাহাড় একটি কঠোরভাবে সংরক্ষিত এলাকা হওয়ায় এবং এর ভৌগোলিক কারণে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাও (IAEA) স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে পাকিস্তানের কোনো পারমাণবিক স্থাপনা থেকে কোনো বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের নির্গমন হয়নি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিরানা পাহাড়ের বাঙ্কারের টানেল প্রবেশপথ বা HVAC ডাক্টের উপর ভারতের আক্রমণের দাবিটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই আক্রমণ অস্বীকার করেছে। তবে, যথেষ্ট জল্পনা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা

চলছে যে কিরানা পাহাড়, যা কেউ কেউ সারগোধার কাছে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক সংরক্ষণাগারের সাথে সংযুক্ত বলে বিশ্বাস করে, একটি লক্ষ্য ছিল। কিছু প্রতিবেদনে সারগোধার মুশহাফ বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণের কাছাকাছি কিরানা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা এই গুজবগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অন্যরা অপারেশন সিন্দুরের সময় ভোলারি এবং জ্যাকোবাবাদের মতো পাকিস্তানি বিমানঘাঁটির ক্ষতি দেখানো স্যাটেলাইট চিত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু এই প্রতিবেদনগুলি কিরানা পাহাড়ের ক্ষতির সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত নয়।

পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হওয়া অপারেশন সিন্দুর মূলতঃ সন্ত্রাসী অবকাঠামো ধ্বংস এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী শিবিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। ভারতীয় কর্মকর্তারা জোর দিয়েছিলেন যে এই আক্রমণগুলি "কেন্দ্রিক, পরিমিত এবং অনুত্তেজক প্রকৃতির" ছিল এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও পাকিস্তানি সামরিক সংস্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। পরবর্তী প্রতিবেদনগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরে আইএএফ নয়টি পাকিস্তানি বিমানঘাঁটি এবং একাধিক রেডার সাইটে আক্রমণ চালিয়েছে। সংক্ষেপে, যদিও কিরানা পাহাড়কে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বিশেষ করে পারমাণবিক স্থাপনার সাথে এর যোগসূত্রের কারণে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সরকারী অবস্থান হল যে তারা কিরানা পাহাড়ে হামলা করেনি। অপারেশন সিন্দুরের সময় রিপোর্ট করা ক্ষতি মূলতঃ পাকিস্তানি বিমানঘাঁটি এবং সন্ত্রাসী অবকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত।

ভারতের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি বহুমুখী এবং সুসংহত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, যা শত্রুপক্ষের বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোনকে ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করতে বাধা দিতে সক্ষম। এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, উন্নত প্রযুক্তি, এবং কঠোর অপারেশনাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভগুলি হলো:

(১) ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম (IACCS): এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মস্তিষ্ক। IACCS একটি স্বয়ংক্রিয় কমাণ্ড এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন রেডার, সেন্সর, যুদ্ধবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে এক সুতোয় গেঁথে রাখে। এটি রিয়েল-টাইমে শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। অপারেশন সিঁদুর-এর সময় এই সিস্টেমের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে, যখন এটি সফলভাবে শত্রুপক্ষের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে।

(২) রেডার নেটওয়ার্ক: ভারতের সীমান্ত বরাবর এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শক্তিশালী রেডার নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই রেডারগুলি শত্রুপক্ষের বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোনের গতিবিধি শনাক্ত করতে সক্ষম। রেডারগুলি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে এবং স্থল-ভিত্তিক, আকাশ-ভিত্তিক (যেমন এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল বা AEW&C বিমান) এবং নৌ-ভিত্তিক রেডারগুলির একটি সমন্বিত জালিকা রয়েছে।

(৩) ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা (Surface-to-Air Missile — SAM Systems): ভারত বিভিন্ন পাল্লার SAM সিস্টেম মোতায়েন করেছে, যা শত্রুপক্ষের আকাশযানকে ভূমি থেকে ধ্বংস করতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(ক) ব্রহ্মস (BrahMos): এটি একটি সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল, যা ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে। এর নামটি এসেছে "ব্রহ্মপুত্র" (ভারতের নদ) এবং "মাস্কভা" (রাশিয়ার নদী) নামদু'টির প্রথমাংশ মিলিয়ে। ব্রহ্মোসের বৈশিষ্ট্য হ'ল এর: (১) সুপারসনিক গতি (এটি ম্যাক ২.৮ থেকে ৩.০ গতিতে চলতে পারে, যা শব্দের গতির তিনগুণ। এত দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা শত্রুর জন্য অত্যন্ত কঠিন। (২) নির্ভুল লক্ষ্যভেদ (এটি ভূমি, জল ও আকাশ থেকে ছোড়া যায় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঘাত করতে সক্ষম) (চিত্র ১)।

চিত্র ১: ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র

(খ) S-400 Triumf: এটি রাশিয়ার তৈরি একটি অত্যাধুনিক দূরপাল্লার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা একই সময়ে একাধিক লক্ষ্যবস্তুকে (বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন) নিশানা করতে পারে। এটি ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

(গ) Akash (আকাশ): এটি ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি স্বল্পপাল্লার ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে এবং ৫০ থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরত্বে যুদ্ধবিমান, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম (চিত্র ২)।

চিত্র ২: আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র

(ঘ) Barak-8 (বরাক-৮): ভারত ও ইসরায়েলের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা যে কোনো দিক থেকে ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে (স্থল ও নৌ) মোতায়েন করা যায়।

(ঙ) কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল (QRSAM): ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO) দ্বারা তৈরি এই ব্যবস্থা কম উচ্চতায় উড়ন্ত ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুদ্ধবিমানকে দ্রুত নিশানা করতে পারে। এটি ৩৬০ ডিগ্রি কোণে নজরদারি চালায় এবং ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। সম্প্রতি এর "সোয়ার্ম ড্রোন" (ঝাঁকে ঝাঁকে

ড্রোন) ধ্বংস করার ক্ষমতা সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

(৪) যুদ্ধবিমান (Fighter Aircraft): ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানের একটি শক্তিশালী বহর পরিচালনা করে, যা আকাশসীমা প্রতিরক্ষা, আক্রমণাত্মক অভিযান এবং শত্রুপক্ষের বিমানকে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধবিমানগুলি হলো:

(ক) Sukhoi Su-30MKI: এটি ভারতের প্রধান যুদ্ধবিমান, যা রাশিয়া এবং ভারতের যৌথ উদ্যোগে তৈরি। এটি একটি মাল্টিরোল ফাইটার, যা আকাশ থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণ করতে সক্ষম।

(খ) Dassault Rafale (ডাসো রাফেয়েল): ফ্রান্স থেকে কেনা এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ভারতীয় বিমান বাহিনীর সক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এটি উন্নত রেডার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম এবং উচ্চ নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: ডাসো রাফেয়েল

(গ) Dassault Mirage 2000, Mikoyan MiG-29, HAL Tejas (তেজস) (চিত্র ৪): এই বিমানগুলিও ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণ সক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্র ৪: এইচএএল তেজস

(৫) ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW) সিস্টেম: ভারত শত্রুপক্ষের রেডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নির্দেশিকা ব্যবস্থাকে জ্যাম করার জন্য অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম ব্যবহার করে। এই সিস্টেমগুলি শত্রুর হামলা চালানোর ক্ষমতাকে ব্যাহত করে এবং তাদের ক্ষেপণাস্ত্র বা বিমানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে সাহায্য করে। জিপিএস স্পুফিং (GPS Spoofing) এবং হাইব্রিড যুদ্ধের হুমকি মোকাবেলার জন্য ভারত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

(৬) এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল (AEW&C) বিমান: এর উদাহরণ ফ্যালকন (Phalcon) এবং নেত্র (NETRA)। এই বিমানগুলি উড্ডয়নরত অবস্থায় ব্যাপক এলাকা জুড়ে নজরদারি চালায় এবং শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদান করে, যা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে।

(৭) ড্রোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা (Anti-Drone Systems): সাম্প্রতিক সময়ে ড্রোন হামলার হুমকি বেড়ে যাওয়ায় ভারত ড্রোন মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে লেজার-ভিত্তিক সিস্টেম, ইলেকট্রনিক জ্যামার, এবং ছোট পরিসরের ক্ষেপণাস্ত্র ও বন্দুক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (BSF) প্রায় ৩০০টির মতো ড্রোন আটক করেছে যা পাকিস্তান থেকে এসেছে, যা সীমান্ত সুরক্ষায় তাদের সক্ষমতার প্রমাণ।

(৮) অপারেশনাল কৌশল এবং পদ্ধতি:

(ক) স্তরযুক্ত প্রতিরক্ষা (Layered Defence): ভারত একটি স্তরযুক্ত প্রতিরক্ষা কৌশল অনুসরণ করে, যেখানে বিভিন্ন পাল্লার এবং ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এর অর্থ হলো, যদি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শত্রুর হামলা থামাতে ব্যর্থ হয়, তবে পরবর্তী স্তর সেই হামলাকে প্রতিহত করবে।

(খ) সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং স্থল বাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলি উচ্চ সতর্কতায় থাকে। যে কোনো সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত শনাক্ত এবং মোকাবিলা করার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

(গ) সমন্বিত গোয়েন্দা ব্যবস্থা: ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য পরিকল্পনা এবং গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে, যা প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে সহায়তা করে।

(ঘ) নিয়মিত মহড়া: ভারতীয় সামরিক বাহিনী নিয়মিতভাবে বিমান প্রতিরক্ষা মহড়া পরিচালনা করে, যা তাদের প্রস্তুতি এবং সমন্বয় ক্ষমতা বাড়ায়।

এই সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি ভারতের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে এবং শত্রুপক্ষের যে কোনো বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন হামলা সফলভাবে প্রতিহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারত সারা পৃথিবীকে সতর্ক করে দিয়েছে যে নুতন ভারত স্বাধীন, আর সেই স্বাধীনতার সম্মান করে সে। ভারত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। নিরপেক্ষ ভারত তার মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যে কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারত প্রতিনিয়ত জাগ্রত থাকবে। জলে স্থলে আকাশে কিম্বা বিদেশের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে ভারতের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পিছপা হবে না।

"প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া ওঠে। সেই আদর্শকে স্বার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়।"

— তরুণের স্বপ্ন — নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

চিত্রশিল্পী: শ্যামল দে

প্রচেষ্টা

অর্পিতা মিত্র

সত্যি কথা সোজাসাপটা বলা কি যায়?
যায়, শুধু ঝড়টা একটু প্রবল হয়।

তুমি প্রশ্ন করা পছন্দ করোনা আমি জানি
কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে যে প্রশ্ন করাটা জরুরি।

খালি পায়ের ছাপ নষ্ট করে ভিজে আলপনা,
আমি বলি এমন নান্দনিকতা নিন্দনীয় নয়।

নিষেধের ঘেরাটোপে অফুরন্ত যে ভালোবাসা,
তার ঘোর কাটতে দেরি লাগে না, সে কি তুমি জানো না?

কেন তোমার ঝুলি পূর্ণ হলে উদ্বৃত্ত আমার ভাগে?
চলো আজ আমরা একসাথে অপূর্ণতা নিয়ে পূর্ণ হই।

সঠিক সিদ্ধান্তের দায় তোমার একার নয়
আমার নির্ভয় ভুল না হয় পেলবতা আনুক।

স্রোতের বিপরীতে হাঁটা, সে তো আমাদের দুজনেরই
তাহলে একে অন্যের হাত ধরতে অসুবিধা কোথায়?

যখনই আলোর দিকে হাত বাড়িয়েছি ...
হাজারটা নিয়ন বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছো, সে কি ছিল আমার দানাপানি?

আমাকে তুমি কখনো ছোটো করোনা জানি,
কিন্তু পিঠে হালকা একটু চাপড় হয়তো এগিয়ে দিতো যোজন দূর!

তোমার সাথে আমার প্রতিযোগিতার সম্পর্ক নয়,
এ হলো আমার আমিকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

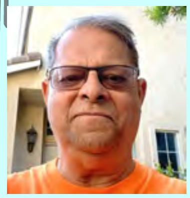

প্রদীপমেসোর বিপদ

দীপক বাগচী

আমার প্রদীপমেসো আজীবন টীটোটালার (teetotaler বা teetotaller)। গাঁজা, আফিং, চণ্ডু, চরস, তামাক, সিগারেট ও কফি খান না; এমনকি চা -ও তাঁর পছন্দের পানীয় নয়। পানাশক্তও নন তিনি. পান-দোক্তা চোখের বিষ। সেই প্রদীপমেসোকে এর দরুন কী বিপদে পড়তে হয়েছিল সেই ঘটনাই এখনে বিবৃত করতে যাচ্ছি।

সে অনেক দিন আগের কথা। মেসোমশাইরা তখন আমেরিকায় এসে প্রথমে নিউ ইয়র্কে উঠেছেন, কুইন্সে। সেখানে অল্পদিন থাকবার পর নিউ জার্সিতে কাজ নিয়ে চলে জান আর সেখানে এলিজাবেথ নামের এক শহরে বাস করতে থাকেন। মেসো কলকাতায় রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ড্রাইভার্স লাইসেন্স পেয়েছিলেন আমেরিকায় আসার প্রায় দু'মাস আগে। আর এলিজাবেথে থাকাকালীন উনি আমেরিকায় প্রথম ড্রাইভার্স লাইসেন্স পান, আর তা' পেয়েছিলেন গাড়ী চালানোর পরীক্ষা না দিয়েই। কী করে পেয়েছিলেন সে কাহিনী আপনারা পড়ে থাকবেন[1]। লাইসেন্স পাওয়ার কিছুদিন পরেই মেসোমশাই একটা গাড়ি কেনেন, কিন্তু সেই গাড়ি চালাতেন না তেমন। কারণ, লাইসেন্স থাকলে কী হবে, তিনি তখনও গাড়ী চালানোতে রপ্ত হননি বা গাড়ীর চাল বোঝেননি কেননা কোন গাড়ীই তাঁর পরিচালনায় থাকেনি। আর গাড়ী চালালেও প্রথম প্রথম বেশী দূরে যেতেন না। বড় জোর কাছাকাছি কোনও দোকানে বা কাছের কোন শহরে, যেমন মাঝেমাঝে জার্সি সিটিতে যেতেন এক পূর্বপরিচিতের বাড়ীতে।

ঐ গাড়ী কেনবার আগে ও পরে কিছুদিন যাতে তিনি গাড়ী চালানোয় রপ্ত হ'তে পারেন, সেজন্য তিনি গাড়ী চালানো অভ্যাস করেছিলেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তাঁর কর্মক্ষেত্র নিউ জার্সির হ্যাকেনস্যাক মেডোল্যাণ্ডস নামের এক এলাকায়, যেখানে কাজের তাগিদে প্রায়ই তাঁকে যেতে হ'ত। সে জায়গাটায় সবে গড়ে উঠছিল বহু গুদামঘর, মালপত্র কাছে বা দূরদূরান্তে রপ্তানী করার আগে কিছুদিন মজুত রাখবার জন্য। সেখানে বহু মালবাহী ট্রাকের যাতায়াত তখন সবে শুরু হয়েছে মালপত্র সেখানে রেখে যেতে বা সেখান থেকে নিয়ে যেতে। সেখানে অনেক চওড়া চওড়া রাস্তা থাকা সত্ত্বেও তখনও সেগুলোতে যানবাহনের বিশেষ ভিড় থাকত না। তাই জায়গাটা ছিল গাড়ী চালানো শেখার পক্ষে খুবই উপযুক্ত স্থান।

এখানেই গাড়ী চালিয়ে চালিয়ে গাড়ী চালানোতে মেসোমশাই পারদর্শী হ'য়ে উঠলেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই মেসোমশাই ফ্লোরিডার নেপলসে একটা ভাল কাজ পেয়ে সেখানে যেতে মনস্থ করলেন, নতুন কোম্পানীর খরচায় পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসন ও আসবাবপত্রসহ। এই নেপলস শহরটা গাল্ফ অব মেক্সিকোর তীরে আর মায়ামি থেকে পূর্বে ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত সুন্দর একটা জায়গা।

যাই হোক, মুভার (স্থানান্তরকারী) কোম্পানীর লোকেরা এসে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা ক'রে নিয়ে গেল, আর যা পড়ে রইল তা তাঁর গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে ১,২০০ মাইল দেড় দিনে গাড়ী চালিয়ে আর পথে দুই রাত্রি মোটেলে কাটিয়ে নিউ জার্সির এলিজাবেথ থেকে রওনা হ'য়ে ফ্লোরিডার নেপলস শহরে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে সমুদ্রের কাছাকাছি আগে থেকে ঠিক করা একটি মোটেল-এপার্টমেন্টে উঠলেন কিছুদিনের জন্য, আর নতুন কর্মস্থলে চাকুরীতে যোগ দিলেন।

ফ্লোরিডার নিয়ম অনুযায়ী স্থায়ী বসবাসকারী হিসাবে দশ দিনের মধ্যে ফ্লোরিডার ড্রাইভার্স লাইসেন্স সংগ্রহ করা অবশ্যকর্তব্য। তাই ফ্লোরিডায় গাড়ী চালানোর নিয়মাবলীর পুস্তিকা সংগ্রহ ক'রে মেশোমশাই পড়ে নিলেন আর লিখিত পরীক্ষা দেবার জন্য ওখানকার ডি.এম.ভি.-র (ডিপার্টমেন্ট অব মোটর ভিয়েকলসের) অফিসে গেলেন।

সেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে লিখিত প্রশ্নপত্র পেয়ে উত্তর দিতে শুরু করলেন। পরীক্ষাপত্রের প্রশ্নের উত্তর ছিল মাল্টিপল চয়েস, যা'তে চারটি করে উত্তর লিপিবদ্ধ করা ছিল যার একটি সঠিক। চারটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে কলম দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। কিছু মামুলী প্রশ্নের উত্তর মেসোমশাই নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর জানা, তাই সঠিক উত্তর বেছে চিহ্নিত ক'রে প্রশ্নোত্তর করতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না। সবই ঠিক চলছিল, কিন্তু মেসোমশাই থমকে গেলেন একের পরে এক কতকগুলো প্রশ্ন দেখে। সেগুলো সবই ডি.ইউ.আই. (ড্রাইভিং আণ্ডার দ্যা ইনফ্লুয়েন্স) অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ী চালানো সংক্রান্ত। কখনো শাস্তি দেওয়া হবে লাইসেন্স সাসপেণ্ড (বাজেয়াপ্ত) করে, কখনো ক্যানসেল (বাতিল) করা হবে, আর কতই বা হবে শাস্তির মেয়াদ? মেশোমশাই এগুলো নিয়মাবলির বইয়ে পড়লেও, মাদক দ্রব্য সেবন করেন না বলে তেমন গুরুত্ব দেননি, ফলে মনে রাখতে পারেননি। সাসপেণ্ড, ক্যানসেল ও রিভোকের ভোকাবুলারীর জালে জড়িয়ে জর্জরিত হ'য়ে পরলেন। বেশ কয়েকটা প্রশ্ন ছিল ঐ বিষয়ের ওপরেই।ঐ প্রশ্নগুলোর কিছু উত্তর সঠিক না হ'লেই পরীক্ষা পাশের ভুলের মাত্রা অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাতেই হ'ল বিপদ। পরীক্ষায় পাশ না করলে তাঁর তখনকার মত গাড়ী চালাবার অধিকার যদি না থাকে, তবে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফিরবেন কী ক'রে? তিনি যে একাই এসেছেন গাড়ী চালিয়ে। ওঁনার স্ত্রী, অর্থাৎ আমার বিনিমাসিও যাননি সঙ্গে। আর গেলেই বা কী হ'ত? বিনীমাসি গাড়ী চালাতেন না তখন, তাঁর তো ড্রাইভার্স লাইসেন্সই ছিল না তখন।

যাই হোক চারটি উত্তরের মধ্যে একটা উত্তর আন্দাজে দিলেও পরিসংখ্যানের গাণিতিক মতে ২৫ শতাংশ সঠিক হয়, এই সূত্রে বিশ্বাস ক'রে মেশোমশাই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন ক্রস চিহ্ন দিয়ে, আর সূত্রের যাথার্থ্য প্রমান করে মেশোমশাই পরীক্ষায় পাশ ক'রে গেলেন। হাতেকলমে আর পরীক্ষা দিতে হয়নি এর পরে নিউ জার্সির লাইসেন্সের খাতিরে!

———————————————————————

[1]"প্রদীপমেসোর ড্রাইভার্স লাইসেন্স", খেয়া, ৪৯তম বর্ষ, ১৪৩০ সাল (ইং ২০২৩), পৃষ্ঠা ৬৪ দ্রষ্টব্য।

খোলা মনে[1]

প্রদ্যোৎ গুপ্ত (প্রয়াত)

(শ্রীমতি সুদীপ্তা গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত পূর্বপ্রকাশিত রচনা)

গাড়ি থেকে নামতেই ঠিক চীৎকার শুনতে পেলাম. “কাকু এসেছে, কাকু এসেছে।” ছুটতে ছুটতে চলে এলো গাড়ির কাছে। নেমেই জিজ্ঞেস করলাম, “কি খবর রূপা? কেমন আছ? তোমার বাবা কোথায়?” রূপা কোন উত্তর দিলো না, হাত ধরে টেনে আমাকে নিয়ে চললো বাড়ির দিকে — “কাকু, মা আমায় একটা নতুন খেলনা কিনে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে খেলবো।” ওর হাত ধরে প্রায় দৌড়োতে শুরু করলাম।

নিউইয়র্কে নতুন এসেছি, দেশ ফেরত অসফল ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে। আমেরিকার গল্প ও স্বপ্ন অনেক আবেশ এনেছিলো দেশে। দেশকে তখনো ভালবাসতে শিখিনি। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে নতুন একটা জীবন আবিষ্কারের ইচ্ছায় কেরিয়ারটাকে নিয়ে যখন টানা-হ্যাঁচড়া করছিলাম, তার মাঝেই বেশ কয়েকজন বন্ধু আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছে। ওদের প্রতিজনের যাওয়ায় আমার দীর্ঘশ্বাসটা বেশ জমতে শুরু করেছিলো। হঠাৎ ভিসা চলে এলো রূপকথার গল্পের মতন। দেরি করলাম না আর। মা-বাবার পায়ে হাত দিয়ে আর বন্ধুদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে হিন্দি সিনেমার হিরোর মতো স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিলাম। আমার স্ত্রী ভাস্বতী একটু বেশি কাঁদছিলো, একসাথে যেতে যেতে পারবে না বলে। গুরুজনেরা কেউ কাঁদেনি। হয়তো বর্তমানের আনন্দে, পাড়ায় বিখ্যাত হবার বাসনায় কোনো ফীলিং ছিলো না। নিউইয়র্কে নেমে বিকাশদার সঙ্গে দেখা হলো। বিকাশদা আমার সিনিয়ার, আমাদের কলেজ থেকেই ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছিলেন। বেশ কয়েকবছর হলো এদেশে এসেছেন। দেশে জাস্ট মুখে চিনতাম, এখানে এসে দেখা পেয়ে খুব ভালো লাগলো। বৌদির সঙ্গে পরিচয়টা জমিয়ে নিতে একটুও দেরি করলাম না। প্রতি উইকএন্ডেই নেমন্তন্ন থাকতো; দেশে ভোজনরসিক ছিলাম, এ দেশে নিজের এ-বি-ডি-বি (আলুভাতে ডিম ভাতে) আর চলছিলো না। বিকাশদার দু’বছরের মেয়ে রূপা তার ওপর আমার বিরাট একজন ‘ফ্যান’ হয়ে গেলো। কুইন্সে বিকাশদা ছোট্ট একটা বাড়ি কিনেছেন। বেশ ফাঁকা জায়গা, আশেপাশে কয়েকটা গাছ আর পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা গিয়েছে যেটা সচরাচর এখানে দেখা যায় না।

বিকাশদা আর বৌদি দুজনেই সঙ্গীতে বেশ আগ্রহী। প্রায় প্রতি শনিবারই বাঙ্গালী মহলের আয়োজন হত তাঁদের বাড়িতে, তার সঙ্গে গল্পদাদুর আসরও বসতো। আমেরিকার একটু গালাগালি, দেশের ফেলে আসা জীবনের ছেঁড়া পাতার আলোচনা ও চাকরির গল্পে যখন ছেলেরা মশগুল থাকত, আমি তখন এক কোনায় রূপার সঙ্গে খেলা করছি। খাবার সময়ই শুধু আমার উপস্থিতি। বাচ্চা আমার বরাবরই ভালো লাগে; ওদের হাসি, সরলতা, অবুঝ কথা, মুখভঙ্গী সবকিছুর দিকেই তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। রূপাকে ভারী মিষ্টি লাগতো। ওদের মতো মিশতে পারতাম বলে বাচ্চারাও আমাকে ভালোবাসতো। রূপা আমাকে ছাড়তেই চাইতো না। প্রতিবারই ওকে ছেড়ে এলে ভীষণ কাঁদতো। বৌদি বলতেন, "রূপা তোমার দিদিমা ছিল আগের জন্মে।"

ভাস্বতীর দেশ থেকে আসার পর বিকাশদার বাড়িতে যাওয়া কমে গেল। প্রায়ই রূপার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হতো, ও যেতে বলতো, অথচ আমার যাওয়া হয়ে উঠতো না। ভাস্বতীকে বলতাম, "আমার ভালো লাগে না এই সব শপিং সেন্টারে যাওয়া .....।" ভাস্বতী বলতো, "জানো, রূপা আমায় হিংসা করে।" আমি হাসতাম, খুব হাসতাম। যেজন্য বাচ্চাদের ভালো লাগে, তা হল, ওরা কোন কিছু উল্টো চিন্তা করতে পারে না। বলতাম, "তোমরা নারী জাতি বুঝি তাই।"

প্রায় এক মাস পর আসছি বিকাশদার বাড়িতে। সামান্য একটু শীত পড়েছে, শরতের রোদ আর ঝরাপাতার মাঝে দিনটা চকমক্ করছে। ভাবলাম এই দিনে বাইরে রূপার সঙ্গে বল লোফালুফি খেলতে ভালো লাগবে। রূপার হাত ধরে ওর টয়-রুমে পৌঁছালাম। বাচ্চাদের একটা মুভি প্রজেক্টর জন্মদিনে বিকাশদা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা ফিল্ম আছে। রূপা সগৌরবে ঘোষণা করলো, "এটা আমার টি. ভি. কাকু, দেখো কি সুন্দর!" আমি চালিয়ে দেখলাম, ও দেখলো, প্রশ্ন করলো, বোঝালাম। কিছুক্ষণ পর বললাম, "রূপা বল খেলবে?" রূপা কোনো উত্তর দিল না, বল নিয়ে বাড়ির বাইরে ঘাসে ছুট দিলো। বল লুফতে না পেরে পড়ে যাচ্ছে, হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আমি খেলছি আর ওকে দেখছি। হঠাৎ রূপা বলল, "তুমি আর আমার জন্য কেয়ার করো না, একটুও। আজকাল খেলা করতে আসো না।" আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে বললাম, "তোকে বলার জন্য গল্প বানাই, জানিস্?" সঙ্গে সঙ্গে "গল্প বলো," বলে আমাকে টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চললো।

এভাবেই কাটতো রূপার সঙ্গে গল্প করে। আমার যেমন গল্প ফুরোয় না, ওরও তেমন শেষ হয় না শোনার। তার মাঝেই হঠাৎ ছোট ভাইয়ের বিয়ের খবর এলো দেশ থেকে। ভাস্বতীও দেশে যেতে পারবে বলে খুশী। দেশে বন্ধু মহলে আমেরিকায় থাকার প্রতিপত্তিতে যে সম্মান পাবে সেটা চিন্তা করে আমি বিবেকানন্দের মৃত্তিকায় পাড়ি দিলাম। মাসখানেক পরেই ফিরে এলাম। ভাস্বতী রয়ে গেল দেশে বন্ধুদের কাছে আমেরিকার গল্প শোনাবে বলে। এসে শুনলাম বিকাশদা নুতন চাকরি নিয়ে টেক্সাসের ডালাসে চলে গিয়েছেন। মনটা খারাপ লাগলো, অসহায় লাগলো। খুব ভালো একজন বন্ধু এত দূরে চলে গেল।

রূপার অনুপস্থিতিটাই আরো মনে লাগছিলো। বিশেষ করে উইকএন্ডের দুপুরটা। বেশীদিন আর ভাস্বতীকে দেশে থাকতে দিলাম না। অবশ্য সেটা পরে শুনলাম যে ওর বন্ধুদের কাছে খেতাব-গোছের, "দেখছিস, আমাকে ছাড়া একটুও থাকতে পারে না।"

বলে 'আউট অফ সাইট্, আউট অফ মাইন্ড।" প্রথমে প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিকাশদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হতো, তার পর মাসে একবার, আর শেষে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কথা হতো না। আমিও ইভিনিং ক্লাসে কম্পিউটারের একটা দু বছরের কোর্স নিয়েছি, সময় পেছনে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে প্ল্যান করি, কিন্তু ডালাসে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

নতুন বন্ধুদের মাঝে বিকাশদা, শম্পা বৌদি, আর আমার ছোট্ট বন্ধুটি, রূপা হারিয়ে যেতে লাগলো। কোনো এক বছরের ফোর্থ অফ জুলাইয়ের ছুটির সাথে যোগ করে আরো কয়েকদিন ছুটি নিয়ে পশ্চিমে পাড়ি দিয়েছি। আমেরিকান মিডওয়েস্ট। শিকাগো বেরিয়ে সেন্ট লুইসের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনে দুপুরের দিকে এসে পড়লাম।

হঠাৎ ভাস্বতী চেঁচিয়ে উঠলো, "শম্পাদি!" ওর দৃষ্টি ধরে তাকাতেই একটা শাড়ীপরা কাউকে দেখলাম। থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কে শম্পাদি?" ভাস্বতী হেসে বললো, "বাঃ, তোমার রূপারা!" আর বলতে হল না, মনে যেন একটা আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। রূপার মুখটা মনে পড়লো— পাঁচটা বছরের ব্যবধান পাঁচদিনের থেকেও কম লাগছিলো। চেঁচিয়ে উঠলাম, "বিকাশদা!" ওরা চলে এলো কাছে। রুপাকে চিনতে পারলাম না ! অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, "রূপা কেমন আছ?" উত্তর পেলাম, "ভালো।" উত্তরে কোনো চঞ্চলতা ছিলোনা। শম্পাবৌদি বললেন, "রূপা চিনতে পারছো না? তোমার পুরোনো কাকু? রূপা বৌদির কাঁধ ঘেঁসে মাথা রেখে নির্লিপ্তভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলো। কত বড়ো লাগছে রূপাকে, স্ল্যাক্স পরেছে, বয়সের তুলনায় অনেক লম্বা লাগছে। বুঝলাম আমাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছে।

খারাপ লাগলো, দুঃখ লাগলো! আমার আর রূপার সেই ফেলে আসার স্বতঃস্ফূর্ত দিনগুলোকে আর মনে করতে ইচ্ছে করলো না। বিকাশদার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার পর বিদায়ের প্রস্তুতির সময় রূপাকে বললাম, "রূপা, তুমি কতো বড়ো হয়ে গিয়েছো। গল্প শুনতে ভাল লাগে এখনও?" রূপা একটু হাসলো; আর একটুক্ষণ পর গুডবাইয়ের মাঝে রূপা মিলিয়ে গেলো।

বিদেশে আর বেশীদিন থাকতে পারলাম না। দেশের টানে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে পারমানেন্টলি ব্যাক করলাম কলকাতায়।

গরুখোঁজার মতো বিদেশের ছাড়পত্র বের করে চাকরির জন্য ধরাধরি শুরু করলাম। অনেক কষ্টে সেলসে একটা চাকরি পেলাম। ভালোই লাগলো। কেরিয়ারের স্বপ্ন তখন একটুও নেই। একটা যে কিছু পেয়েছি, তাতেই নিশ্চিন্তি। তারপর সংসার আরও বাড়বে। এইসব চিন্তার মাঝে সংসারে জড়িয়ে পড়লাম।

অফিসের একটা কাজে জয়পুর যেতে হোলো। সেখানে কোম্পানির একটা বড়ো কাজ ধরতে হবে। সেখানে পরিচয় হোলো ওখানের পারচেস্ ম্যানেজারের সঙ্গে। বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বেশ বয়স হয়েছে, জমাটে লোক। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে মাছ-ভাতের নেমন্তন্ন পেয়ে গেলাম। খাওয়ার টেবিলে নানা গল্পের পর পরিচয় বেরুতেই তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "আরে তুমি চন্দননগরের বীরু সেনের ছোট ছেলে বিল্টু!" আমার কিছু বলার আগেই তিনি আনন্দে হৈ হৈ করে উঠে বলে চললেন, "আরে তুমি যখন ছোট ছিলে, তোমাদের বাড়ি প্রায়ই যেতাম। যখন কলকাতায় থাকতাম তোমার বাবা আমার খুব বন্ধু ছিলেন। তুমি তো আমার কোলে কতো খেলা করেছো, গল্প শুনেছ। কতো ছোট ছিলে তখন। মনে আছে তোমার? আমায় চিনতে পারছো?" আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে ভদ্রলোক চেয়ে রইলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মুখে কোনো কথা নেই। চেয়ারের হাতলটা তখন বিরাট একটা অবলম্বন। রূপার মুখটা যেন হঠাৎ ভেসে উঠলো সেন্ট লুইসের আমার সেই পুরোনো আশ্চর্য দুপুরের পটভূমিতে। অকারণ এক ভালো লাগায় ভরে উঠল মন।

---

[1]প্রদ্যোৎ গুপ্ত, ইমিগ্রেন্ট , প্রদীপ দাশগুপ্ত, এগ্রিকো জামশেদপুর, পৃ. ৫৯ - ৬২।

আমাদের আদর্শ মোক্ষ নয়, ব্রহ্মে লীন হইয়া অনির্দ্দেশ্য অনন্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি নয়, আদর্শ ব্যষ্টির ও সমষ্টির ভাগবত চৈতন্য লাভ, ভাগবত চৈতন্যে ঐক্য সংসিদ্ধ আনন্দ, সেই চৈতন্যে আত্মবান হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রেরিত ভগবৎশক্তি চালিত জীবন ও কর্ম, মুক্তবৎ কর্ম। গীতায় যাহা বলা আছে, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি", সে যোগস্থ কর্ম কেবল এই সাধনার অঙ্গ নয়, সিদ্ধিরও এক প্রধান অঙ্গ। সমস্ত জীবনকে আন্তর ও বাহ্যকে ভাগবত সত্তায় প্রকাশ ও ভাগবত ঐক্যের অভিব্যক্তি করা এই যোগের উদ্দেশ্য ও সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।

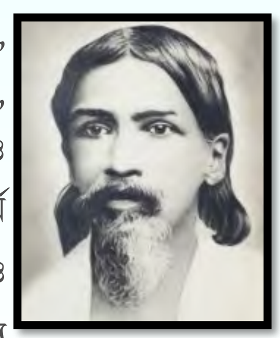

—(পূর্ণযোগের মূখ্য লক্ষণ থেকে) —— শ্রী অরবিন্দ)

প্রগতি সর্বদা সহজে আসে না

দীপক বাগচী

(আমেরিকার প্রয়াত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের "Progress Does Not Always Come Easy"[1] কবিতার ভাবানুবাদ।)

আমার প্রদেশের আইন-প্রণেতা হ'য়ে না যখন আমার
প্রথম আইন লিখলাম যেটি সভায় ভোটটা নিতে,
তা'তে বলা হ'ল "কোন নাগরিক মারা গেলে একবার,
পারবেনা সে নির্বাচনেতে তার ভোটটি তো আর দিতে।"

সাহসের সাথে আমার সহ-আইন-প্রণেতা সবাই
এ সমস্যা নিয়ে তর্কবিতর্কে হ'লেন তখন মত্ত,
কি না, "পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পরে একজনের দেয় ভোটটাই
আরও তিনটি বছর দেওয়া কি বা হবে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত —

"স্মরণ ক'রে তা'র স্মৃতিটিকে যাতে পরিবার তার পারে
ধ'রে নিতে কী ভাবে তাদের প্রিয়জন ভোট দিত;
পরবর্তী কালের ভোটের দিনটি পারতো সে দেখিবারে,
সেই দিন তক যদি সেইজন রইত হইয়া জীবিত?"

আমার আপন প্রতিবেশীকুল সাবধান করি' কয়,
"বাড়াবাড়ি হবে বহুদিনের এমন প্রথাটা তো পাল্টালে";
ফলে ক্যাম্পেন বৃথা হয়ে যায়, আর যে পাড়াতে রয়
একটি মাত্র সমাধিক্ষেত্র, তা'ও খোয়ালাম শেষকালে।

র‍্যাপিড সিটি, সাউথ ড্যাকোটায় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্রতিমূর্তি

[1]Carter, Jimmy. Always a Reckoning, and Other Poems, New York Times Books (1995).

গীতার বিচারে খাদ্য ও অখাদ্য

সুকুমার পাল

গীতা শুধু আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনশাস্ত্র নয়, এতে আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের অনেক সমাধানের সূত্র রয়েছে। আমরা সবাই এখন সুষম আহার সম্পর্কে খুব সচেতন। কী খাওয়া উচিত বা কী খাওয়া অনুচিত এ নিয়ে সবসময়ে আলোচনা করে থাকি। খ্যাদের মাধ্যমে আমরা পুষ্টি অর্জন করি যা আমাদের বল বা এনার্জি দেয়। বলা বাহুল্য, এখন সবাই স্বীকার করে যে অপুষ্টিজনিত খাদ্য বা জাঙ্ক ফুড আমাদের বহু রোগের উৎস। বর্তমানে খাদ্যের গুণাগুণের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে গীতায় খাদ্য ও অখাদ্য নিয়ে কী বর্ণনা আছে এবং বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক যুগের সাথে তার কতটা মিল।

গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ের ৮, ৯ ও ১০ শ্লোকে তিন ধরনের ব্যক্তির খাবারের কথার উল্লেখ রয়েছে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥৮॥

অর্থাৎ, "যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে এবং আনন্দ ও সুখ বাড়ায়, সরস ও স্নিগ্ধ, যাহার ফল বহু কাল থাকে, যাহা আহারে আনন্দ হয় তাহা সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়॥৮॥"

এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা কী ধরণের খাদ্য খান। তাঁরা সব সময় সুষম খাদ্য গ্রহণ করেন, যা শরীরের পক্ষে উপকারী। এর ফলে এই সকল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকেন। প্রত্যেক মানুষেরই এই ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এককথায় বলা যেতে পারে যে, শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে আমাদের সবাইকে সাত্ত্বিক খাবারের দিকে নজর দিতে হবে।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহীনঃ।

আহরা রাজসস্যেষ্টাদুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯॥

অর্থাৎ, "অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবনাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি ঝাল, অতি তীক্ষ্ণ - এই সকল খাদ্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয়। ইহা হইতে তাহারা দুঃখ শোক ও ব্যধিগ্রস্ত হয়॥৯॥"

এই শ্লোকের মূল কথা হল অতি মাত্রায় উগ্রস্বাদযুক্ত কোনো কিছু না খাওয়া। সাধারণত তেতো খাবার, যেমন উচ্ছে, অল্প মাত্রায় আমাদের শরীরের পক্ষে ভাল। কিন্তু অতিরিক্ত কটু বা তিক্ত খাবার খেলে আমাদের নান ধরণের পেটের সমস্যা, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, বুক জ্বলা, প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। কিছু কিছু লোকের মাথা ব্যথাও হয়। অনেক দিন ধরে অতি মাত্রায় কটু খাবার খেলে অনেকের এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা দেখা যেতে পারে। রান্নার সময় অম্ল বা লেবুর রস ব্যবহার করা হয়ে থাকে স্বাদের জন্য। কিন্তু খাবারে যদি বেশি মাত্রায় অম্ল ব্যবহার করা হয় তবে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

বেশী অম্লযুক্ত খাবার খেলে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয়, অ্যাসিড রিফ্লাক্স ও ইরিটেবলে বাওয়েল সিনড্রোম নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশনের (এএমএ) সুপারিশ অনুযায়ী আমরা রোজ ২,৩০০ মিলিগ্রাম বা এক চামচ লবন খেতে পারি। (রক্তচাপের রোগীর লবনের মাত্রা দিন প্রতি ১,৫০০ মিলিগ্রাম।) কিন্তু এর থেকে বেশি লবন খেলে আমাদের শরীরে নানা ধরণের সমস্যা হয়। যেমন অতিরিক্ত তৃষ্ণা পায়, রক্তের চাপবৃদ্ধি হয়, মাংসপেশীতে টান ধরা (সোডিয়ামের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার জন্য), কিডনির রোগ, কিডনি স্টোন, এমনকি কী স্ট্রোকও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রোসেসড্ মাংস, মাছ, চীজ ও আচারের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে লবন থাকে।

সাম্প্রতিক কালে নিউট্রিশনিস্টরা এইসব খাবার বেশী পরিমাণে খেতে বারণ করেন। তাঁরা মনে করেন বর্তমান কালে ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, স্থূলতা, কিডনির অসুখগুলির যে এপিডেমিক হচ্ছে, তার কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোসেসড্ ফুড খাওয়া। তা হলে গীতায় ঠিকই বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত তেতো, টক, লবনাক্ত, উষ্ণ, ঝাল ও তীক্ষ্ণ খাবার খেলে দুঃখ, শোক ও ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥১০॥

অর্থাৎ, "যে সকল খাদ্য বহু অগ্রে তৈয়ারী করা হইয়াছে, রস যাহার শুকাইয়া গিয়াছে, বাসি, দুর্গন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট তাহা তামসিক ব্যক্তির প্রিয়॥১০॥"

এই শ্লোকে আমরা দেখবো তামসিক ব্যক্তির খাবার খেলে কী হয়। যেকোন খাবার তৈরী করে বেশিক্ষণ বাহিরে রাখলে তাতে নানা ধরণের ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক বাসা বাঁধে। ওই জীবাণুযুক্ত খাবার খেলে আমাদের অবসম্ভাবী পেটের রোগ হবে। ওই সমস্ত খাবারে জীবাণু জন্মায় বলেই দুর্গন্ধ হয়। এই পচা খাবার খেলে আমাদের আমাশয়, রক্ত আমাশয়, এমনকি কলেরাও হতে পারে। উপরন্তু ওই সব খাবারে খাদ্যের কোন পুষ্টি থাকে না। এই খাবার খেলে উপকারের চেয়ে বেশি অপকার হয়।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে আমাদের উচিত শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য সব সময় সাত্ত্বিক ব্যক্তির খাবারের মতো খাবার খাওয়া। সেটা গীতার অনুশাসন মেনেই হোক বা ডাক্তারের পরামর্শ মতো হোক।

চিত্রশিল্পী: রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

অ্যাণ্টার্কটিকার অঙ্গনে

শিখা কুণ্ডু

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেলো ক্রমে
মধু'দা ও শিখা'দি যাবে অ্যাণ্টার্কটিকা-সঙ্গমে ..."

এক বছর ধরে একটু একটু করে দিন এগোচ্ছিল। অ্যাণ্টার্কটিকা যাবো কি যাবো না ভেবেছি। MK, আমার স্বামীর এক গোঁ, "যাবো।"

অবশেষে যাত্রা শুরুর দিন ঠিক হলো ২০২৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর। চারিধার থেকে শুভেচ্ছা এলো, "খুব ভালো করে ঘুরে এস।"

বুয়েনোস আইরেস এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের লাইনে পৌঁছে দেখি যোগ ক্লাসের ক্রীস ওর স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। বিদেশে একটা চেনা মুখ অনেক আশ্বাস দেয়। পৌঁছলাম হোটেলে। আমাদের অন্য বন্ধুরাও হাসিমুখে হাজির।

ঘরটা খুব পছন্দ হলো। তিন বাঙালি মিলে ডিনারে হার্ড রক কাফেতে পৌঁছলাম। প্রচুর ভিড়। ওয়েটারের সঙ্গে বেশ সময় লাগলো খাবারের অর্ডার দিতে। এর পরের ঘটনাতে আমাদের সন্ধেটা পুরো বদলে গেল। পিছনে তাকিয়ে দেখি চেয়ারের পিছনে রাখা পার্স হাওয়া। নেই তো নেই। সর্বনাশ! পাসপোর্ট কি ছিল? চশমা, ফোন, কার্ড, সব গেল? আমি দিশেহারা। ম্যানেজার কোনো হদিস দিতে পারলোনা। অনেক আশঙ্কা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। MK প্রথমেই ছুটলো রুমে; আঃ, আমাদের পাসপোর্ট দুটো টেবিলের উপর। বিদেশে এটাই যে লাইফলাইন। পুলিশ এসে রিপোর্ট নিলো, কিন্তু বুঝলাম কিছুই হবেনা। শুরুতেই একটা ধাক্কা খেলাম।

১৩ই ডিসেম্বর: সকালে একটা চার্টারড্ প্লেন আমাদের উসোয়াইয়া (Ushuaia) পোর্টে ভাইকিং ক্রুজে (Viking Cruise) পৌঁছে দিলো। মন থেকে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে রুমে গিয়ে দেখি খুব বিশাল, লাগেজও এসে গেছে। ব্যালকনি থেকে চট করে বাইরে সমুদ্র দেখছি, এর পর পনেরো দিন কত রূপ দেখবো! সেফটি মিটিং সেরে এসে হিটেড ক্লসেটে উইণ্টার জ্যাকেট, ওয়াটার রিপেলেন্ট প্যান্ট, এক্সকারশন বুটের ট্রায়াল হলো। সব প্রিঅর্ডার দেওয়া ছিল। সব ধরা চূড়া পরে একেবারে স্নোম্যান হয়ে কী করে জোডিয়াক বোটে[1] (zodiac boat) যাবো?

ক্রুরা জানালো জল বেশ শান্ত। এত যত্ন করে সবাই। আর ভাইকিং যেন আরও সতর্ক। ডিনারে হোস্ট ছিল এক নেপালি মেয়ে। এত হাসিখুশি। কাউকে ছেড়ে কথা বলেনা, MK তার সমকক্ষ পেয়েছে। ডাইনিং হলের পাশে ছড়ানো ছিটানো লাইব্রেরি, আমাদের এই ট্রিপের উপরে নানা বই, এছাড়া হালকা বইও আছে, যার যা পছন্দ। রাত নয়টা নাগাদ ক্যাপটেন ঘোষণা করলো, "আজই কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজে (Drake Passage) ঢুকবো।" এর সম্বন্ধে এতো শুনেছি, ভয় পেয়েছি। তবে আবহাওয়া বলছে আমাদের যাত্রা শুভ

হবে। কানের পিছনে প্যাচ লাগিয়ে, ড্রামামাইন খেয়ে ঘুম এলো চোখে।

১৪ই ডিসেম্বর: "আহা কি হেরিলাম নয়ন মেলে!" দুপুরের দিকে শুরু হলো বড়োবড়ো স্নো-ফ্লেকস্ পড়া। অদ্ভুত, সেগুলো সমুদ্রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে। আধঘন্টার মধ্যে পুরো জলের উপরটা বরফের প্রলেপ হয়ে গেল। নিঃশব্দে সাদার্ন সী (Southern Sea) যেন হয়ে গেল আইস স্কেটিং রিঙ্ক (চিত্র ১)। শুধুই দু'চোখ ভোরে দেখো। ধীরে ধীরে ঘোর কাটলো। আজ আমাদের প্রথম জোডিয়াক আউটিং। একটার পর একটা লেয়ার চাপিয়ে গেলাম ল্যাণ্ডিং জোনে। জাহাজে আমাদের সমস্ত বহিরাবরণ চেক করলো, যাতে কোনো বহির্বিশ্বের অর্গানিক্স আমরা অ্যান্টার্কটিকা আইল্যাণ্ডসে আমদানি না করি। আর্জেন্টিনাতে এভিয়ান ফ্লু পৌঁছে গেছে। খুব চেষ্টা করছে যেন সেটা এখানেও না পৌঁছায়।

চিত্র ১: সাউথ বে যেন আইস স্কেটিং রিঙ্ক

কোনো দড়ি বা সিঁড়ি ছাড়া বোটে নামিয়ে ক্রু আমাদের হাত ধরে বসালো। চারিধারে পদ্মপাতার মতো বরফ ভাসছে। ওগুলোর নাম আইস প্যানকেক।

দু'তিনতলা সমান আইসবার্গ, খুব কাছে গেলাম, নীল রং ঠিকরে বের হচ্ছে। নাকের নিচে একটু খালি-জায়গা ছাড়া বলবো বেশ সুরক্ষিত ছিলাম আমরা। প্যাটাগোনিয়া ও অ্যালাস্কাতে গ্লেশিয়ার দেখেছি, এখানে যেন আদিগন্ত ছড়ানো। আজ দুপুরে জাহাজের সামনের দিকে তিমি ও তার দলের খেলা শুরু হলো। টেলিফটো লেন্সে পটাপট ছবি উঠছে। কায়াকে যে দল গিয়েছিল, তারা তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। খুব বড় স্নো-ফ্লেক্সের বৃষ্টি হচ্ছে ব'লে। "সেফটি ফার্স্ট অলওয়েস।" রুমে এসে একটা একটা করে আস্তরণ খুলছি। ওই রাবার বুট নিজে খোলার সাধ্য কি?

জাহাজে অন্ততঃ দশ জন মেরিন বায়োলজিষ্ট, পিএইচ.ডি ছাত্র ও সায়েন্টিস্ট আছে। তারা অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন সময়ে নানা লেকচার দেয় ও ছবি প্রদর্শন করে।

১৫ই ডিসেম্বর: আজ রোদ-ঝকঝকে সকাল। জাহাজ নোঙ্গর করেছে যেন বিস্তৃত নদীর বুকে। শীপ ক্যাপটেনের ঘোষণা শুনে ডেকে গেলাম। তিমি ও সামুদ্রিক পাখিরা সাঁতার কাটছে। আকাশ নীল, তার বুকে মাথা উঁচু করে পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে। এরা কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো, চিসেল এজড্, সোনাঝরা রোদে জড়িয়ে আছে। দুপুর তিনটের সময় আমাদের ল্যাণ্ড ট্যুর হবে ড্যাময় পয়েন্টে (Damoy Point)। পোশাক পরে জোডিয়াক বোটে চড়লাম। আজ বোট অনেক শান্ত। ৫-৬ মিনিট পরে গোড়ালি ভেজা বরফ জলে নামলাম।

ক্রুদের হাত ধরে পাথর, বরফের সিঁড়ি পার হয়ে দ্বীপে উঠলাম (চিত্র ২)। ধু ধু করছে শুধু স্নো। উপরে দু'ফুট স্লাশ। তার নিচে ব্লু আইস। একটু দূরে পেঙ্গুইনের কলোনী। শুধু নির্ধারিত পথে চলতে হবে। এখন ওদের বাচ্চার জন্ম ও তাদের স্বাবলম্বী করবার সময়। একটা নিদিষ্ট স্থান থেকে ঝটপট ছবি তোলার পালা। ভারী মজার ওদের হাঁটা পিছন দুলিয়ে দুলিয়ে। দূরে দূরে দুটো আস্তানা আছে। একটা আর্জেন্টিনার, অন্যটা ব্রিটিশদের (চিত্র ৩)। ১৯৫০ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা এই আস্তানা তৈরী করেছে বেঁচে থাকবার জন্য।

চিত্র ২: ড্যাময় পয়েন্টে MK ও লেখিকা

আস্তানার ভিতরে রাখা বাঙ্ক বেড, কিচেনে রাখা কেটলি, কফি, ক্যাণ্ড ফুড। সমস্ত জিনিস অক্ষত আছে, কোন পলিউশন নেই। একটা টিলার উপর কিছুটা সমতল স্থান, সেখানে ছোট প্লেন নামতো। আজ আমরা ওভার-ড্রেসড। ওই ভারী পোশাক এ কাদাকাদা বরফে হাঁটা বেশ কষ্টকর। বেশ গরমে ভুগেছি। আমরাও পেঙ্গুইনের দেশে গিয়ে ওদের মতো হেঁটেছি। এক সহযাত্রীর বুট ডুবে গেল বেশ গভীরে। বেশ কসরত করে তাকে বেলচা চালিয়ে মুক্ত করলো।

ডিনারে বন্ধুদের পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলাম। ভাইকিং থেকে কেক ও শ্যাম্পেন দিলো, সুন্দর সন্ধ্যেটা কাটলো। কিচেনগুলোতে অনেক ভারতীয় শেফ আছে। তারা নানাভাবে আমাদের খাবার যুগিয়েছে।

চিত্র ৩: অভিযাত্রীদের আস্তানা

১৬ই ডিসেম্বর: আজ জাহাজ নোঙ্গর করলো চিরিউয়ানো বেতে (Chiriguano Bay)। দু'চোখ ভোরে শুধু দেখছি; কত রকমারি আকার। আদিগন্ত শুধু বরফের পাহাড়, ক্যামেরার লেন্স কতটুকু ধরবে! আজও সূর্য অফুরন্ত। যদিও এখনও পর্যন্ত এটি একটি অদূষিত মহাদেশ, তবু গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ছোঁয়া এখানেও লেগেছে। জোডিয়াকে ধরাচুড়ো পড়ে যাত্রা শুরু। বরফের চাঙড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। প্রশ্ন করাতে বোটের চালক জানালো যে এই নৌকা সামরিক বাহিনী গ্রেডের নৌকা, খুব শক্ত রবারে তৈরি। মনে শান্তি পেলাম। শুনলাম চিরিউয়ানো বেতে সমুদ্রের গভীরতা ১,০০০ ফুট। আঁতকে উঠি।

একটা সীল অলসভাবে রোদ পোহাচ্ছে বরফের চাঁইয়ের উপরে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: বিশ্রামরত সীল

বোটের চালক জল থেকে স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফের চাঁই তুলে আমাদের হাতে দিলো (চিত্র ৫)। বললো বহু শতাব্দী ধরে এই বরফ তৈরী হয়েছে, তাই কোনো ট্র্যাপড্ এয়ার নেই। ইঞ্জিন বন্ধ করে আমাদের শুনতে বললো, একটা কড়কড়ে শব্দ। বরফের পাহাড় থেকে আটক পড়া বায়ু বার হচ্ছে। কিছু গ্লেশিয়ার নাকি চলমান, নিজের চাপ, আয়তন ও ওজনের জন্য ইচ্ছেমতো এগিয়ে যায়। এক জায়গাতে পাহাড় থেকে বরফ ধসে পড়ছে। দেখে আর আশ মেটেনা। দু'টো পেঙ্গুইন ডুব দিচ্ছে আর উঁকি মারছে। হঠাৎ এক হাম্পব্যাক তিমি দেখলাম। জল খুব শান্ত। দীর্ঘ শীতে মস, শেওলা সবাই বরফের স্তূপে হারিয়ে যায়। এখন তারা জেগে উঠে ক্লোরোফিলের সাহায্যে পুষ্টি সংগ্রহ করছে। বোটে বসে দস্তানা ছাড়াই ছবি তুললাম। ৩০ সেকেণ্ডে বেলুন উড়ে গেল। আগামী ১২ ঘন্টা ধরে আবহাওয়ার তথ্য জানাবে। বারবিকিউ লাঞ্চ ফসকে গেছে, কিন্তু ট্রিপের পর টাটকা নান্ আর ল্যাম্ব কারি খুব আরামদায়ক হলো। এখানে তো কখনো অন্ধকার হয়না, একটা যেন আলো-আঁধারির খেলা চলে।

আমরা অনেকে ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগর এর নাম জানি। তার ছেলে ও বৌ এর সঙ্গে আলাপ হলো। আমাদের সময়ে টেস্ট ক্রিকেট রিলের কথা মনে পড়িয়ে দিলো। এখন পর্যন্ত আবহাওয়া খুব সহযোগিতা করেছে। উষ্ণতা ৩৩-৩৪ ^{0}F। এখানে শীতকালে সমুদ্র জমে সমস্ত ট্যুর বাতিল হয়।

চিত্র ৫: স্ফটিক-স্বচ্ছ বরফের চাঁই

১৮ই ডিসেম্বর: ভোরে উঠে দেখি আকাশ মেঘলা, জাহাজ নোঙ্গর করেছে শার্লট বেতে (Charlotte Bay)। আজ ল্যাণ্ডিং ট্রিপ মুনিয়ে পয়েণ্টে (Meusnier Point)। যখন তৈরী হচ্ছি তখন ঘোষণা করা হলো স্কাউটিং জোডিয়াক ক্রু কোনো নিরাপদ ল্যাণ্ডিংয়ের জায়গা পায়নি। জোয়ারের সময় ও প্রচণ্ড বরফ জমার অবস্থা রয়েছে। তাই কোনো

ল্যাণ্ডিং ট্রিপ আজ হবেনা। তার বদলে জোডিয়াকে ঘুরে বেড়ানো। তাই সই।

১৯শে ডিসেম্বর: কাল থেকে একটু গা ম্যাজম্যাজ করছিলো। টোটকা ও ওষুধ খেয়ে একটু আরাম বোধ করলাম। আজ পর্দা সরিয়ে দেখি এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। কলকাতা এয়ারপোর্টে নামার সময় যেমন দেখি চারিধারে সবুজ ধানক্ষেতের মেলা, এখানে তার বদলে আদিগন্ত বরফের চাদর ছড়ানো সমুদ্রের উপরে, যার নাম সী আইস (চিত্র ৬)। হাওয়ার উপদ্রবে তারা নানা আকৃতিতে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চোখের লেন্স যতটা দেখে, অনুভব করে, ক্যামেরা কি সেটা পারে? দারুন ব্রেকফাস্ট খেয়ে আজ এক্সপিডিশন ডিরেক্টরের বক্তৃতা শুনলাম। কত আবেগপ্রবণ হলে এত সমুদ্র ভালোবাসা যায়! আজও আমরা শার্লট বের অন্য প্রান্তে। যেখানে ঠিক করা ছিল, সেখানে নাকি খুব ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি।

চিত্র ৬ : সী আইস

রোজই অ্যান্টার্কটিকার উপরে মুভি দেখছি। নানাদেশের অভিযাত্রীরা কি অবিশ্বাস্য কষ্ট করে খবর জোগাড় করেছে ভবিষ্যতের জন্য। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভারতসহ সব বড়ো দেশগুলো এই মহাদেশের কর্তৃত্বে আছে। চুক্তি হয়েছে সবার গবেষণা সবার জন্য থাকবে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদে কখনো কেউ হাত দেবেনা। সবই হবে যৌথভাবে।

২০শে ডিসেম্বর: আজ আমাদের দুটো কর্মকাণ্ড আছে। স্পেশাল অপারেশন বোটে (SOB) ট্যুর আর পোর্টাল পয়েন্টে (Portal Point) ল্যাণ্ডিং। ওই ধরাচুড়ো একবার পরে SOB-ট্যুর করে আবার জোডিয়াকে ল্যাণ্ডিং ট্যুর। পোর্টাল পয়েন্টে এ গিয়ে দেখি অন্ততঃ ৪০-৫০ টা ডাফেল ব্যাগ ওখানে রেখেছে। জিজ্ঞেস করাতে বললো যে একই সময়ে প্রতি ট্রিপে ১৩০ জন দ্বীপে আছে। এদের যদি কোনো জরুরী অবস্থায় ওখানে ২৪ ঘন্টা থাকতে হয়, তার জন্য তাঁবু, খাদ্য, শোবার বিছানা, শৌচাগার, গরম রাখার ব্যবস্থা ওরা প্রতি ল্যান্ডিংয়ে নিয়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবহাওয়া খুব খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই এই সাবধানতা। সেটা হলে হতো চূড়ান্ত অভিযান। একজন যাত্রী ওয়াকার নিয়ে হাঁটছে, তার সঙ্গী পাশেই আছে, আমাদের থেকেও কমজোরি লোকেরা সব জায়গাতে আছে, খুব আশাপ্রদ আমাদের জন্য। SOB বেশ জোরে চলে। দু'ধারে তিমিরা চলেছে। উষ্ণতা ২৭-২৯ ^{0}F। হাওয়া দুই গালে যেন সুঁচ ফোটাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আলাদা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। শতকরা ৯৮ ভাগ বরফে ঢাকা। আজ যেখানে জোডিয়াক গিয়ে ল্যাণ্ড করলো, চারিধারে জলে ডোবা পাথর।

বুট ও দুই আস্তরণ প্যান্ট, দু'জোড়া মোজা খুব কাজ দিলো। পাথরের উপরে দিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বরফের পাহাড়ে চড়লাম। হাতে ধরিয়ে দিলো দুটো স্কির যষ্টি সাবধানতার জন্য (চিত্র ৭)। কোনো অভিযাত্রীর বানানো আস্তানাটার শুধু ভিতটা পড়ে আছে। এখানে তুষার খুব শুকনো ও জমাট। কিন্তু কোনো প্রাণী চোখে পড়লনা। আধ ঘন্টা হাটাহাটি করে বোটে জাহাজে ফিরি। ঢোকার সময় বুট সাবান জলে ধুয়ে শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম দিয়ে শুকিয়ে দিলো। এবার পোশাক পরিবর্তন করে গরম চা-কফি চলবে।

২১শে ডিসেম্বর: আজ একটু দেরি হলো পর্দা খুলতে। রোদ্দুর ভরা, একটু দূরে বরফের পাহাড়। জলে বেশ ঢেউ আছে। ব্রেকফাস্ট শেষ করেই বক্তৃতাকক্ষে বা অলাতে (aula) গেলাম সকলের ব্রীফিং শুনতে। প্যারাডাইস বেতে (Paradise Bay) নোঙ্গর করে জোডিয়াকে আইল্যাণ্ড ল্যাণ্ডিং। সবাই বেশ উত্তেজিত এই জন্য যে আরও অন্য জাতের পেঙ্গুইন দেখতে পারি। মারমুখো সীলও আছে। তারপর জিওলজিস্টের বক্তৃতা খুব ভালো লাগলো।

চিত্র ৭: অভিযাত্রীদের মত আমরা

সব কটা মহাদেশ কোনো এক সময় একই ভূখণ্ড ছিল, এক সুপারমহাদেশ, নাম যার প্যানজিয়া (Pangea)। হয়তো আমাদের ভারত ও অ্যান্টার্কটিকা একই ছিল! আবার কোনো এক দিন টেকটনিক প্লেটের অবস্থান পরিবর্তনে প্যানজিয়া আলটিমা (Pangea Ultima) গঠিত হয়ে সব এক হয়ে যাবে। খুবই খারাপ কথা। আজ হাওয়া ৫০ নটের বেশি, সব ল্যাণ্ড এক্সকারশন বাতিল।

২২শে ডিসেম্বর: আজ আবার নতুন সূর্য উঠেছে। আজই শেষ হবে সব এক্সকারশন. আমাদের ল্যান্ডিং এর সময় দেখে তৈরী হচ্ছি। এবার বলি আমার 'লেয়ার্সের' কথা। থারমাল প্যান্ট, থারমাল জামা, সোএটশার্ট, ভাইকিংয়ের দেওয়া দুটো জ্যাকেট, গেইটার, টুপী, হ্যাণ্ড ওয়ার্মারসহ দস্তানা, দু'জোড়া উলের মোজা, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রবারে বুট, ওয়াটার রেপেলেন্ট প্যান্ট। তার উপরে সেফটি লাইফ জ্যাকেট, পকেটে ফোন। কিছু ভুলে গেলাম না তো? আজ অভিযান শেটল্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের (Shetland Island) অংশ লিভিংস্টোন আইল্যাণ্ডে (Livingstone Island)। এখানে বরফ কম। যেদিকে তাকাই এলিফ্যান্ট সীল ও পেঙ্গুইনের খেলা (চিত্র ৮ ও ৯)।

চিত্র ৮: সীল ও পেঙ্গুইনের রোদ্দুর পোহানো

চিত্র ৯: পেঙ্গুইন মা ও ছানার জমায়েত

পূর্ণবয়স্ক মর্দা সীল মিলন সেরে সমুদ্রে ফিরে গেছে। মিলনের সময় মর্দা সীলরা উপবাস করে। তাই ওদের এখন খুব খিদে। মাদী সীলরা যখন ছানাদের খাওয়ায় তখন তারা উপবাস করে। পেঙ্গুইনরা ওদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে। কি মিষ্টি লাগছে। এবার বোটে জাহাজে ফিরছি। হঠাৎ কড়কড় আওয়াজ করে বোট থেমে গেলো মাঝ সমুদ্রে। ড্রাইভার একটুও না ঘাবড়িয়ে আবার স্টার্ট দিলো। হয়তো বরফের টুকরোতে ধাক্কা লেগেছিলো।

সব এক্সকারশন শেষ। সেই কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজ দিয়ে ফেরা। কেউ জানিনা এবার সে কী রূপ নেবে। লিভিং রুমে আর্টিস্টরা বেহালা ও পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে।একটা টিউন একেবারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর। খুব ভালো লাগলো চেনা সুর। জাহাজের দোলা কম। জাহাজের রেস্টুরেন্টে বেশ কিছু ভারতীয় আছে, একটা ছেলে বাঙালি, কলকাতা লেকটাউনে থাকে। এছাড়া দিল্লী, কেরালা, উত্তরাখণ্ড, শিলিগুড়ি নানা জায়গাতে তাদের বাড়ি। ৪ মাস, ৬ মাস নানাজনের নানা কর্মের চুক্তি। তারপর দু'মাস ছুটি। কারুর মা অসুস্থ, টাকার দরকার; কারুর বৌ-মা বাড়িতে, ছেলে মানুষ করছে। প্রতিটা ক্রুয়ের মুখে কত হাসি, অথচ প্রিয়জনের থেকে কত দূরে! আমাদের আরামে রেখেছে চব্বিশ ঘন্টা।

আজ জলের কাছাকাছি অনেক সীগাল উড়ছে। এই মহাসমুদ্রে আমার প্রশ্ন- কোথায় ওদের বাড়ি? যখন ক্লান্ত হয় কোথায় বসে?

অলাতে শেষ পার্টি শুরু হলো, শাম্পেনের ছড়াছড়ি! কমবয়সী গায়ক গায়িকারা সুন্দর বীটলদের গান শুরু করলো, অনেকে গলা মিলালো। হল গমগম করছে। এক স্বামী-স্ত্রী জুটি রোজ মিলিয়ে পোশাক পরে সবার নজর কেড়েছে, খুবই মিশুকে। শুনলাম এলিফ্যান্ট পয়েন্টে (Elephant Point) শেষ বিকেলে যে দল গেছে, তারা ল্যাণ্ডিংয়ের পর, জোয়ার এসে ল্যাণ্ডিংয়ের জায়গাটা পুরো ডুবে যায়। তখন তারা অনেকটা হেঁটে অন্য ধার থেকে জোডিয়াক বোটে করে ফিরে আসে। সর্বত্র উত্তেজনা! আজ বিকেলে ডেকে গিয়ে দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে রূপোলি পাখি ঠিক জলের সমান্তরাল উড়ছে। যেই জলের মধ্যে ওরা ঠোঁট ছুঁয়ালো, আর যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথা থেকে এলো, কোথায় ওরা যাবে?

ক্যাপটেন ঘোষণা করলো আগামীকাল, ২৩শে ডিসেম্বর সকাল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে জাহাজ কেপ হর্ন (Cape Horn) পাড় হবে। ওটা দেখতে হলে উপরের ডেকের সামনে (Bow-এ) যেতে হবে। এবার তো ফিরে যাচ্ছি। অনেক জমা হলো মনের মন্দিরে।

---

[1]হাওয়া দিয়ে ফুলানো অনমনীয় রবারের নৌকা।

প্রতিবাদের ভাষা চাই

(আর জি কর মেডিকেল কলেজে সেই নারীর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে)

প্রণব মিশ্র

সুন্দর ছিল পৃথিবীর দিনগুলি
দেখেছি যে আমি অজস্র পর্দায়
ভরে উঠেছিল কত নানা অনুরাগে
কত নরনারী আসন্ন সন্ধ্যায়
বৃদ্ধ খুঁজেছে তাঁর প্রিয় বৃদ্ধাকে
তরুণ খুঁজেছে তার সমানত আঁখি
বাতাস বয়েছে যে রাগিনী গান গায়
নীড়ে ফিরেছিল কত গান গাওয়া পাখি
আজিও তেমনি সন্ধ্যা নামছে দূরে
আজিও তেমনি ভোরের তারারা ওঠে
তফাৎ তো শুধু আজকের শুকতারা?
চিতা বহ্নি সে আমার এ মুখ ঢাকে।

এবারেও ছিল সেই দৃঢ় প্রত্যয়
এবারেও শিশু তেমনি প্রতীক্ষায়
মা'র কোলে ঝাঁপ দিয়েছিলো.....
দেখো
একই সে সরলতায় ....
একই প্রতিবাদে ছুটেছিল সব মাঠে, অরণ্যে, পথে।

এবারেও ছিল দেশে ও বিদেশে লোক
সমবেত ছিল স্টেশনে গাড়িতে মাঠে
এবারেও তারা একই কথা ভেবেছিলো
কালকে সকালে সব মেঘ যাবে কেটে

এমন মৃত্যু দেখেনি তো কেউ আগে
ফিরেছিল তারা
আমার দেহের স্তব্ধ ধমনী ধরে
কেঁদেছিলো তারা
চীৎকারে প্রতিবাদে।

শাস্তি চাই, দণ্ড চাই,
চাই সে প্রতিবিধান
অগণ্য সব মানুষের ভিড়ে
বন্ধ কান্না
নিশ্বাসহীন খুঁজছি ফিরছি আমি।

কবরে শোয়ানো আমার এ দেহ জানে
মৃতদের মাঝে ভাষা হারাবার মানে।

নিশ্বাসহীন খুঁজছি ফিরছি আমি।
দেহহীন হয়ে খুঁজছি ফিরছি আমি।

কবরে শোয়ানো আমার এ দেহ জানে
মৃতদের মাঝে ভাষা হারাবার মানে
তফাৎ তো শুধু আজকের শুকতারা?
চিতাবহ্নি সে আমার এ মুখ ঢাকে।

A Study in Hues, Heat and Height

Sabyasachi Mitra

As we settled down in our seats, exhausted yet content, my wife leaned over and asked, “So which would you rate your top three?” Like a dutiful and long married husband, I responded. When I asked her the same question, she paused, reflected and with a twinkle in her eye said, “All at par.” Well, that summarizes our perspectives on the journey we took. It was a spontaneous trip we took after a break to our usual travelholic lifestyle. Here is what we experienced. I will try to capture a shade of how we felt.

Study in Hues and Heat (a lot of heat)

Michealangelo is attributed to have once said “The true work of art is but a shadow of the divine perfection.”

As we age and see the world more, this rings truer every day. We had wanted to see the Antelope Canyon for some time now; but for many reasons we had not been able to do so. The Canyon sits in the red rocky deserts of Arizona. Located near Page, this slot canyon is in Navajo land and is known for its stunning views of sunlight filtering and reflecting off the walls. We had flown from our home to Las Vegas and as soon as we landed, we literally got toasted with a dry heat of 107°F. We rushed to our hotel and had an early dinner to get ready for our big day. We had booked a 14-hour tour to Horseshoe Bend and Upper Antelope Canyon. The bus came around 5:15 am in the morning and with anticipation we got ready to see Nature’s work of art.

The trip was long -- really long, and it went through Nevada, Utah and Arizona before it arrived in Page. Interestingly our phone switched times every so often, as it connected to Utah and Arizona timezones constantly. Our guide Aloe (yes like the plant, she said) mentioned we had finally arrived at Horseshoe bend. This is where the mighty Colorado river, after swerving and cutting through years of geological mountains, did an about turn thus creating a Horseshoe-like formation (Photo 1). The temperature was 112°F and not an inch of cloud in the sky. We braced ourselves and said to each other, “Well time for some serious Vitamin D.” We started walking and went down an incline. Scorching heat and red path with not

Photo 1. Horseshoe Bend

even a tree in sight. We walked and walked until we came to an iron shelter. Thanks to whoever built it, we took a rest. Many were standing there, some beet root red, we a healthy burnt egg-plant color. The road was only 30% over; so, we continued and got to the next leg, again panting and drinking water while water quickly evaporated from our body. Finally, after an almost a mile and half walk, we reached the spectacular sight.

The horseshoe lake as we saw was indeed a study in red, browns, green and blue. This reminded me of my Geography lessons in school. There were few people who were also boating around river; it must have been beautiful to see the rocks surrounding you as you cruised across the river meandering through the layers of ancient geological rocks. We had to turn around and walk back. What comes down must go up; this inverse adage felt painfully true as we trudged slowly panting for breath across the red-hot rocks. Finally, we arrived. It was a great experience; I only wish it was cooler.

From thereon, our driver took a break after a long and arduous trip and handed us over to a Native American driver. He had a kind face, weathered with time with eyes gleaming with pride and dash of sadness of loss of their own land. We showed our respect for allowing us to enter their sacred land, the holy land of Antelope Canyon.

The area was once under the ocean which many years ago dried up and sand blew in from various directions and piled up. Years of heat and pressure built up the sandstone layers, which cracked causing a slot canyon.

Then entered the water artist, flash floods. swirling waves of water cut through the rocks causing beautiful patterns, jut-outs, and curves. This is a true testimony of how Nature carves and paints. As the sun shines through the top, bouncing off the different layers and shapes, it creates sensational imagery of light and shadow of colors. I do not have words to describe how gorgeous it was, so I shall pause and share glimpses of what

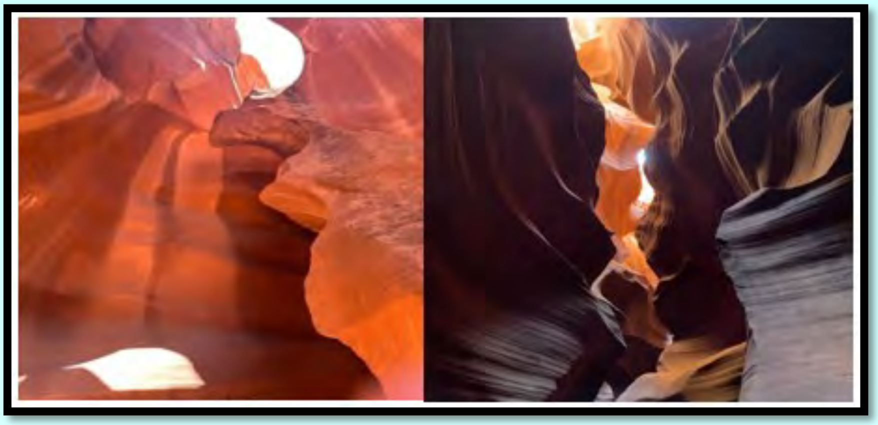

Photos 2 and 3. Two views of the Antelope Canyon with sun's rays creating magic

the camera captured, but these are mere shadows of indescribable beauty (Photos 2 and 3). We returned with hearts wanting to wait and see more but time was short.

As a memory, we carried home two ceramic pieces (Photo 4) which were made and signatured by local artists. We learned when heating the pieces, they throw horse hairs at the pieces which singes upon contact, creating masterpieces frozen in time. Photo 4 shows their unique style of ceramic pottery.

Photo 4. Ceramic Handicrafts

Study in Hues and Height (a lot of height)

We flew from Las Vegas to Denver the next day, ready to climb new mountains (nod to my favorite Sound of Music song). The Rocky Mountains spans from Canada to New Mexico. We were blessed to see it from Banff in Canada and it was breathtaking (Photo 5).

Photo 5. Shades of Rocky Mountains

Entry to park is timed. We didn't realize before leaving that timed entries are a

must if you need to enter between 9 am and 2 pm.

Bookings get sold out months in advance, which incidentally opens just for a few seconds at 7 pm local time the day before. With a little bit of luck, we managed to get a slot. The drive from Denver to the Rockies was uneventful and we proceeded to drive up the mountains. Having stayed in the planes, our ears started popping and we developed a slight headache as we drove higher into the spectacular mountains. In every turn, the views of the majestic mountains showed its different hues.

Mountains have a way of teaching us. It speaks of grandeur without pride, it speaks of power of silence, it speaks of endurance to stay tall when the weather around your life changes, it teaches tolerance in face of adversity. We stood like children in the lap of the timeless rocks interspersed with snow glistening in the sun shining through the cerulean sky, with winds gently caressing us. It was a memory to retain forever. It reminded me of a quote from John Muir: “Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees.” We saw lot of flora and fauna along the way, including some curious elk calves who were fearlessly roaming around the winding roads munching on the vegetation. We went up to the Alpine Visitor Center which is the highest point of the Trail Ridge Road. At 11,796 feet, it is the highest visitor center in US National Parks system. The alpine tundra views were breathtaking, pun intended as the thinned air did make us dizzy at times. We finished our lunch against the backdrop of the serene landscape and went on to see the Bear Lake. One thing we learned – weather can change rapidly here. The bright sunshine turned into grey, somber looking clouds and the lightning flashed several times as we raced towards another timed entry. Rain washed, the views of Bear Lake were somewhat muted, but we did catch the large droplets of rain creating numerous circular mini waves on the lake against the mountains. We returned home with our hearts content and eager to continue to the next leg of the journey – Aspen Snowmass. Sometimes knowing little turns out to be a blessing. We took the Independence Pass: Denver to Leadville to Aspen. It’s the quickest route despite crossing the Continental Divide 3 times with hairpin bends, paths barely enough for two cars side by side and dropping to more than 10,000 feet with no railings. I

realized in my bones what it means to experience something that is both beautiful and dangerous at the same time.

But it was the shimmering leaves of rows of Aspen trees reflecting sunlight that brought about the childlike quality of the otherwise solemn mountains. Founded in 1879 as a silver mining town, Aspen became associated with the US Army's 10th Mountain Division during World War II, evolving into a ski haven.

Aspen was a very different experience, somewhat like the quaint playgrounds of the rich. A different class of visitors who arrive by private jets, live in the fabled Jerome Hotel, sip expensive wines while their nannies take their children out for strolling. Maybe we should visit in winter for its full beauty. The highlight and what would remain etched in memory was Maroon Bells (Photo 6). A visually stunning lake against the backdrop of the two bell-shaped mountains each over 14,000 feet.

The hues come from the iron-stained siltstone. The scene has similarity to the Emerald Lake in Canada. No wonder this is a major attraction and totally worth the multiple bus trips and the trek. The lake with wild swans swimming in it, the abundance of aspen trees with the glimmering leaves against the majestic maroon colored twin peaks that was indeed a perfect harmony of Nature. We drove back to Denver and thanks to a good decision by my wife, we decided to take a less scenic route with lesser turns. It was one of the wisest decisions as it rained so hard for so long that we could not see anything more than 10 feet ahead. The trip ended after almost four and half hours of arduous driving. A huge sigh of relief left our lips, on arriving safely.

Photo 6. Maroon Bells - Aspen

Photo 7. Manitou Cliff Dwellings

Exhausted and ready to head home, we had one last place to visit - Manitou Cliff Dwellings (Photo 7).

We originally had thought of visiting Mesa Verde but couldn't be due to the lack of time. Manitou evoked similar feelings of awe and respect for the early Pueblo Native Americans who carved homes and lived in the cliffs. Their culture, ways of living and art are all preserved in the museum. These provide rare glimpses of the footprints of Ancestral cliff dwellers.

From there on, we went for a brief tour of the Garden of Gods. It features dramatic red rock formations against the backdrop of Pike's Peak.

We saw the famed balancing rock (Photo 8) and the towering Three Graces. These lands were considered sacred by the Native American tribes. Memories of Uluru came rushing back. Wherever Man exists, respect to Nature is a testimony to living in harmony with Her.

As we completed our tour of traveling back in time, watching Nature play its role in creating exquisite architecture and coloring it in millions of shades, it was a reminder that it is our responsibility to preserve them for posterity. As far as what my top three were, it is for you, my esteemed reader, to guess and let me smile.

Photo 8. Balancing Rock – Garden of Gods

Life — a Sojourn

Saheli Majumdar Banerjee

It was the worst afternoon. It was the saddest afternoon in my life. It was a summer Sunday. The day started like any other Sunday — slow leisurely summer weekend. I woke up late and had my morning tea staring blankly at the TV screen. The newsreader on the screen was trying to read some disturbing news with earnest expressions. Nothing was different than any other Sunday morning. It turned out to be a little odd around noon. I was cooking for the week when my husband came and asked me — Isn't it the 5th today? Aren't we supposed to be at Sam's house for lunch? I looked at him, I looked at the calendar, hanging on the wall in front of me, "lunch at Sam's" was written on today's date.

Can you please call Sam and let them know that we will be running a little late as something unexpected came up. I will be ready in a few minutes. I ran to take a shower.

We were driving to Sam's place. The freeway was half empty as the June afternoon sun was glaring on the surface of the road. The mountains in the distance looked hazy and dusty.

I was staring outside blankly and out of the blue, a weird wave of thoughts came to my mind - I will hear something about baba today. I tried to divert my mind instantly and looked at my husband who was in the driver's seat. He didn't notice anything. I sighed and looked outside again. My thoughts came back. I could vividly see our home in Kolkata, India, where Baba was lying on his bed.

We will be really late for lunch- my husband's voice broke the silence. We were the last guests to arrive. Friends were chatting, laughing and gossiping like any other Sunday gathering. I tried to be engaged but my mind was elsewhere.

Lunch was served at Sam's place, and I forgot about the thought for some time. The food was very tasty. Sam's wife Rita is a skilled cook. The dessert was served. I was looking for my phone which I couldn't find; suddenly I felt a soft tap on my shoulder. It was my husband. He called me into the room next to the din-

ing room. No one was there when he handed me his mobile phone. He put his hand on my shoulder. I looked at the screen. I saw my niece's name on it.

My niece was on the phone from India. It was about Baba. Dadun is no more. He left us half-an-hour ago-I could hear my niece's voice. I tried but I couldn't speak. My mom was on the phone. I could hear her weeping. I stood there holding the phone. My husband took the phone from me. It was 4:30 am in Kolkata, India. We left Sam's place immediately. All our friends hugged me, consoled me.

While driving home from Sam's place I was numb and shocked. I was thinking about the thoughts that came to my mind a few hours ago. How did it come to my mind that I would get news of Baba today? He was unwell for more than a year, and it never happened before. I talked to him the day before for an hour. He was fine. He couldn't walk but mentally he was sharp. I tried to hold back tears. Everything was watery and drenched outside as if it was raining hard.

My husband called the airlines immediately after we came home from Sam's place and booked the earliest available ticket for Kolkata, India. I was constantly on the phone talking to my friends and family members here and at home for the past few hours. While I was packing my bag, I was asking myself -why am I going to Kolkata?

Do I need to be there now? Baba visited me here a couple of times and the last time he came here, he told me, "you know I may not be able to come here again. This will be my last visit." I did not believe him. But he knew. That was his last visit.

I was sitting all by myself at the airport gate waiting to board my flight the next day. My mind couldn't stop thinking of Baba. Memories of him from my childhood were flashing in front of me like a movie. Suddenly I felt warm tears running down my cheek. I tried to check my emotions. I felt embarrassed even in the midst of grief. How could you be emotional in a public place in front of strangers....? I tried to console myself by saying that Baba was suffering for a long time. He had a good life. But nothing worked. My emotions were stronger than my reasoning. I felt the lump in my throat. I could not hold my tears. I hid my eyes behind the sunglasses. Strangers

were sitting next to me, and I felt helpless.

Even when I did not need to use the restroom, I went there to find solace. During the 24 hours long journey I talked to Baba constantly in my mind. Sometimes as a little girl, sometimes like a stranger. The deep sense of emptiness, the waves of emotions swept me throughout the journey.

I anticipated this day in my mind so many times and thought that I could handle it when the time came. How wrong I was! I didn't know that this journey to Kolkata would be my longest nightmare. During the eight hours of transit at Dubai I could not sleep for a minute. Whenever I tried to close my eyes, memories flooded my mind. At last, the journey was over. I walked towards the exit gate at Kolkata airport. Someone was waiting for me outside.

My eyes were blurry. I prepared the script so many times for this day. But I forgot all the dialogues on stage and was speechless with tears in my eyes. I could see through the glass door my friend and mom were waiting outside to receive me. How could I cry in front of my mom? I dragged my body towards the exit door of the Kolkata airport. I looked up and prayed to the Almighty- give me strength to bear the grief.

You have to walk and walk
miles after miles,
days after days,
till you come to an end.
At the time of the farewell
you leave everything behind
the grieving souls, the loved ones
and you don't look back
We are all sojourners here.

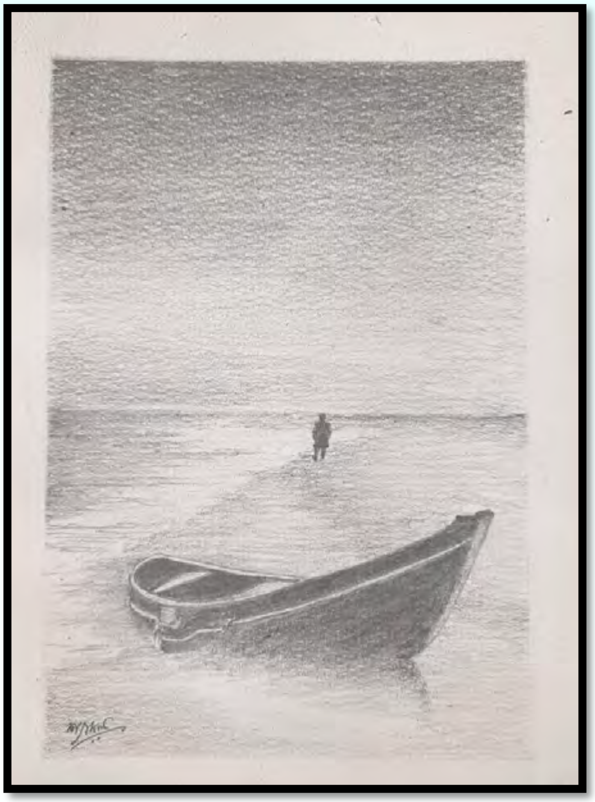

চিত্রশিল্পী: শ্যামল দে

Anubrata’s Awakening

Jyotishko Ganguly

Long before the birth of Christ, renowned Raja Suratha belonged to the Chhedi dynasty and ruled Kalinga (Odissa). Medha Muni was his guide and teacher. He had resurrected the Raja’s life and reigned after the Raja fell into hard times. Such woes befell when he lost his kingdom to his evil ministers and alcoholic envious family members who conspired against him.

Meanwhile his late life guru Medha Muni lived in a simple straw and wooden hut deep inside a dense dark jungle in Karadengha Hills in Chottogram far from the Kalinga capital. He lived near a sparkling lake surrounded by deer cubs, tortoise, and cows. Medha was known for teaching the Sree Chandi and comforting people to deal with disillusionment resulting from Maya, or overly materialistic life. With this sage’s guidance for a month, Raja Surath recited the Durga Saptashati stories to any passerby; stories about the various demons Goddess Bhagwati Mahamaya had killed. Gradually the Raja’s unwavering effort evoked great reverence in his heart for Goddess Durga. For the next one year, the Raja chanted the Goddess’s many adulatory mantras and lived only by eating fruit. In the second year, he ate only dried leaves and worshipped the goddess. He began to frequently see the goddess in his dreams.

After his return to power, Raja Surath began to gratefully worship Mother Goddess Durga in the month of Chaitra in springtime. He came to be known as the first organizer of Basanti Durga Puja in

Prachya Ganga (the eastern side of the Ganga River).

On summer evenings, the Raja and Medha Muni continued to take their usual long chariot rides well outside the palace gar-

dens in the ancient capital of Kalinga. Sometimes they would canter into nearby villages. One day they met Anubrata, a chronically emaciated, prematurely-aged-looking, fifty-year-old vagabond who was periodically forced to beg from door to door. The Raja and his guide vacillated if doling out silver or gold coins would forever solve the drifter's woes.

Anubrata, was a tall, wiry son of a deceased but acclaimed math teacher. Due to his habitually weak physical condition no one had employed him in recent years; not even the grocery store owners or the animal grooming shops. Yet there was a mysterious grace in his bearings no one could explain. Whiff of dried sweat often emanated from every pore of Anubrata's withered, neglected torso and from his faded dhoti. Yet the Raja did not find the have-not's body smell offensive. He lost his mental balance somewhat after his only daughter died after two failed childbirths.

On some days, Anubrata and his wife Sunidhi could afford to eat only a bowl of suji (farina). Prolonged phases of gross humiliation by people around him had cast Anubrata into a state where he spoke with a slight lisp. But when he sang hymns, he sounded like a seasoned temple singer. Sunidhi was the well-read daughter of a wealthy grain merchant. Though she was 15 years younger than Anubrata, in her early youth she fell in love with Anubrata for his looks and erudite lineage. But by now all her husband's virtues and looks had quickly faded. He was only a grim memory of an attractive alluring past.

One day, Raja and Medha Muni visited the hapless beggar in his rundown home made from bamboo and old disfigured bricks. Overwhelmed with pity for the erstwhile good looking beggar's abject state and bleak prospect, the Raja gave Anubrata a bag of gold coins. The vagabond felt overjoyed, but his good luck was short-lived. On his way home just before dusk, the vagabond was confronted by a skinny thief who habitually roamed in the forest. After a brief scuffle, the crook whisked away with the gold coins. Anubrata stood where he was. His teary eyes glistened with helpless rage and his roughened hands bawled into tight fists.

Stammering feverishly, the gangly vagabond blamed his miserable fate and the next day, he set off to beg once more. Shortly thereafter, the Raja and Medha Muni met Anubrata again. They quickly became apprised of the latest mishap and

continuing misery. Raja once again felt great sympathy and gave the destitute four large pieces of uncut diamond.

Anubrata took the diamond home and hid it in an old earthen pot which had been unused for many years. Considering his newfound treasure safe, the vagabond fell into deep sleep after many months. He snored like a jackhammer. The next morning before he woke up, his slender and comely wife Sunidhi, who knew nothing about the gold coin and the diamond, went to fetch drinking water from the river.

On her way back, Sunidhi lost her balance and crashed on a bed of flowers. Alas, her pot broke. Kneeling on the mud, Sunidhi immediately remembered the pot at home which lay unused for months. Jumping to her feet, she dashed back home and brought the pot to the riverside to fill it with water. Just as she dipped the pot in the river the diamond fell off the pot and slid into the river.

When Sunidhi returned home, she found her husband desperately searching the house for the pot. After seeing the pot in his wife's hands, it did not take long for Anubrata to understand what had happened. Inordinately crestfallen, Anubrata set out from home yet again. He felt cursed and concluded that begging was his only way to survive. Weeping incessantly, Anubrata's childless wife began to prepare suji. To flavor her only food of the day, Sunidhi began to crush the few remaining pods of spices with her mortar and pestle.

During yet another evening's chariot ride, Raja and Medha Muni bumped into Anubrata at the edge of a wooded village. The three men stood near a wooden booth with dark green awnings meant for providing rest to all long-distance horse riders. In the sheer silence of an inimitable dusk even the usually sonorous and musical woodcutters were filing past their king's chariot amid pin drop silence.

When the Raja heard of the unfortunate incident afflicting the infirm beggar, he told his brother-in-law, "I don't think Anubrata is destined to be blessed at all. I don't think I can help him anymore".

Medha Muni offered to try again. He then gave Anubrata two disused brass coins, and the dejected man took them and quietly walked away. Raja probed his mystic friend Medha Muni, "If gold coins and diamonds could not change his miserable condition, what good can two disused brass coins do for him?"

Wiping sweat beads from his forehead, Medha Muni smiled and replied, "Let us see".

As Anubrata walked home, he kept cursing his fate when he saw a fish that had freshly been caught by a fisherman. The fish seemed to struggle for its life. Compassion gripped him, while Anubrata wondered, "These two brass coins cannot fetch me a full meal anyway. Instead, let me at least save the life of this creature."

So, Anubrata purchased the fish and was about to throw it back into the river. Just then he noticed that the fish's breathlessness was caused by a large obstruction in its mouth. When the vagabond hurriedly removed it, he found that it was the same diamond he had lost in the river. Overjoyed, Anubrata screamed repeatedly, "Look what I found.... look what I found." At this very moment the thief who had robbed the vagabond earlier in the forest was passing by and heard his shouts.

The thief recognized Anubrata instantly. The thief also concluded that Anubrata was shouting only because he had recognized the thief as his wrongdoer. Terrified that the vagabond may take him to the law officer's court, lodge a complaint and get him executed, the thief rushed towards him and begged for his forgiveness.

Not just that, the thief also returned all the gold coins he had stolen from his handicapped victim, Anubrata. The vagabond felt elated as he walked away joyfully with all his wealth. He went directly to Raja and narrated the amazing turn of events and profusely thanked him for all his help. Utterly bewildered, Raja asked Medha Muni, "How is it that my gold coins and chips of diamond could not help Anubrata, but your meager two brass coins did?"

Medha Muni replied, "When Anubrata had gold and diamonds, he was only thinking of himself and his own selfish needs. But after losing his riches when Anubrata only had two brass coins left, he finally placed the needs of another human before his own."

Raja: "And so...?"

Medha Muni: "And so, the Almighty took care of his needs. When humans intensely feel compassion for strangers who are endlessly suffering and persevere to help them, they reach the thicket of most selfless work the world offers. And hence divinity ensures your relief and liberation."

Few months passed in which Anubrata's redemption bloomed to the fullest. At the end of another evening's chariot ride into Anubrata's village, the Raja and Medha Muni came to know that Anubrata had once again become a math teacher. Also, no one ridiculed his highly diminished stammering anymore. Moreover, Anubrata's wife Sunidhi learned her lesson well this time. She had donated half of the gold and diamonds the Raja gave to the poor tribals in a nearby village. Even in jest, she no longer threatened her husband about leaving him and his village forever and living with her rich, widowed sister. Instead, with great enthusiasm, she began to stitch new raw silk clothes for her husband.

Meanwhile in the palace with boundless appreciation, Raja stared endlessly at his exalted guide Medha Muni and touched his feet reverently. Raja exclaimed with exhilaration: "Goodness, your miracles! You made all this happen...Maharshi..."

Medha Muni shrugged off the royal accolade in his usual humble manner, "I did not do anything. Various people's respective karmic consequences played out to the fullest." The inseparable duo continued walking along the cobbled path just outside their favorite garden. After a full day's hard work, tired masons working in the royal compound sat under a thicket of tamarind trees and sang in unison. Several palace horses grazed languidly in a lush meadow not far from the princely mansions.

By the time the Raja and the Muni returned to the palace's foyer, dusk had begun to usher hints of dew. A palace servant was tending to a new fawn. The front gate's main guard briskly walked towards the Raja and gave him refreshing news: "Anubrata is going to be a father. He came in the afternoon and brought some homemade sweets for us, all the palace guards. He seemed happy. Your Majesty, he said to let you know his improving fortunes. And he kept profusely thanking you, Medha Muni, and the mercy of Goddess Durga."

The Raja and the Muni smiled approvingly like they had not smiled in a long time.

Ghatotkach[1]

Pinaki R Chakrabarti

After graduating from Bengal Engineering College in 1961, I joined Shalimar Tar Products, Kolkata. A month later, I was assigned to a new project in Assam. I arrived in Naharkatia, Assam at the end of summer of 1961 to manage the building of a cooling tower, contracted to us by Burma Oil Company. Soon after we finished that project, probably at the end of December 1961, my boss, Mr. Sarkar, asked me to accompany him to a small township called Nam-Rup. This town was located roughly 10 to 12 miles from our office in Naharkatia. He told me that a new project was about to start there, and I would be managing it.

Next morning we started for Nam-Rup. It was an interesting journey. The road was a regular country road. There were very large trees on both sides, beyond that all one could see was deep forest. At one point we reached a narrow river. Our driver explained to us how we would cross the river. There was a floating raft (about 14 ft x 14 ft) tied to a tree at each end with a heavy rope. Our car was carefully placed on the raft and three of us stood by its side. Two people at the other end started to pull the rope and very soon we reached the the other bank. That was the beginning of Nam-Rup.

Very large trees covered a lot of space on both sides of this small river. Our objective was to build a house for a Gas Turbine (Natural gas was easily available in that locality and the gas turbine was imported from West Germany). This project was initiated to provide enough electricity for approximately five hundred people that would be required to build the future Nam-Rup fertilizer plant and the city around it. I am sure that there were other plans for developing that area which we did not know at that time.

We drove about 3 to 4 miles through the rural road to our future jobsite. All along, on both sides of the road, there were tea gardens. Local women were working all over these gardens. They looked like big white flowers in the middle of endless green tea-plants. Finally, we arrived at the jobsite. Two of our staff members, Pandey and Ganguly, were already there. After a little visual survey, we selected an

approximate location for the future gas turbine building. The jobsite was located on relatively flat land. In the surrounding areas, there were lots of very large mostly deodar, pine and eucalyptus trees and probably some other trees too. About 2 miles away from the flat area there were steep hills. Those were covered with very tall trees too.

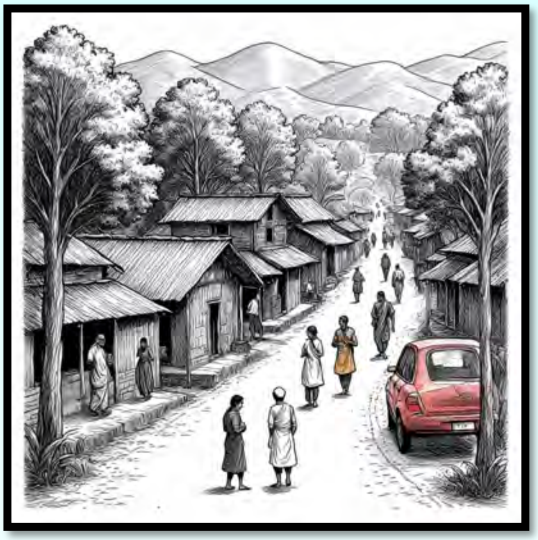

When we reached the jobsite, there already were some people from our company and some of the prospective building subcontractors and suppliers. They came to meet us. We looked around the site and located the approximate position of the future gas turbine building in a relatively flat area. Two of our direct employees were there (Pandey for the construction supervision and Ganguly for the office work). We introduced ourselves to each other. They already started living in a temporary cottage close to the jobsite (the cottages were built using the local materials, like bamboo and bamboo-mats (called chatai in Hindi, which is a mat made of bamboo laths) for the walls and roof and tar-felt that covered the roof and floor. On that day we left the place after a couple of hours. But I started coming back to the jobsite on a regular basis, every other day.

After a couple of weeks, I moved there like all the other members of our office. The place was very cold, especially at night. They dug a hole and lifted water from there. It was filtered and chemically treated to make it drinkable. Unfiltered water was used for everything else. Locally available, bamboo mats were used extensively for making temporary houses, showers, kitchen, etc. for our office staff. For the laborers, masons, mechanics, and the contractors, enough materials were given to them to make their own cottages. People from all parts of India could be seen there.

A young Sikh man, about my age was a subcontractor doing all our carpentry work. It was the time for building new India. There was some happiness in the air. Most people were older than me. But

they would call me Chakrabarti Sahib, an Indian alternate for Sir (or Mr.). They built a house for me at a little distance from the others, using the same bamboo mats, wood, and tar-felt. It had one bedroom, one bathroom, and one sitting room, which was used as an office also. Seeing the location of the house, local contractors advised me not to go out at night. They told me that there were many animals. I knew that the small monkeys lived in the adjacent forests and hills. They would be shouting half the night. There were many types of birds and other smaller animals too. One day some suppliers came to my cottage/office. They were mostly from North India. After our business talks, they told me to make a deep trench around the cottage and put a lot of Phenyl (floor-cleaning disinfectant) in that to prevent snakes. They wished I did not make the cottage on that spot. After some more conversation, I came to know that a rogue elephant walked on that path. I did not know what to make of all those conversations. But I surely was scared, to some extent.

The weather of that place varied from mostly humid to very wet. The humidity was high most of the year. It rained occasionally. However, half the time it would be sunny. On a warm sunny day, the surrounding nature would look breathtakingly beautiful. On one side, there were not so high mountains, but the land was full of very tall trees. Those were mostly pine and deodar trees. Probably there were many other types of trees too. On the other end, at about 150 feet distance from the jobsite, there was a narrow river. I never had sufficient time to look around and find out what was there in those forests.

Our work was going smoothly. Occasionally some of our equipment broke down. All of us gave our shoulders to put that on a truck and to send that to a distant repair shop. The laborers were mostly local people, half of them were from the local tribes (like Nagas). The labor contractor, a local man, dealt with them. We paid him every Saturday, at the end of the day. His name was Nityananda Parui. Not everyone knew his name. He was a

well built and tall man, with a large and almost bald head and large round eyes. He used to bring all the laborers, collected the money from us every Saturday, and paid those men. Basically, he was a labor contractor. We did not make direct contacts or interacted with the laborers. That was an unwritten policy. Nityananda was a very well-mannered and a little different person than the other people I have seen in the construction sites. One day while I was talking with our stuff members in our field office about labor payments, I addressed him as Ghatotkach* because of his size, large bald head and looks – and the way he talked. Somehow that stuck to him. Behind his back, everyone in the office and the staff members started to call him Ghatotkach. He started to find occasions to come to me and talk to me, even though it was not necessary. One day he invited me to come with him to see their village and their school. Their village was about 4 miles away. I did not pay much attention to his request. However, after several requests, I agreed to go to their village and see the village and the school.

On a Saturday, a typical half-day at our jobsite, our driver and I followed Ghatotkach, who was riding a bike. It was a 4-mile drive from our jobsite to the school. Finally, we reached there, and we saw the school. The schoolhouse was a one-story wood building. A part of it was used by Ghatotkach and his family. That consisted of Ghatotkach, his brother and their wives. That was also the entire staff of the school. Later I came to know that whatever they earned they spent on that school. About thirty-five students of different age groups attended the school. Very large trees surrounded the entire area. It was a magnificent place, surrounded by various tall trees, flowering plants and shrubs.

Subsequently, I learned that most of their earnings were allocated to fund that school. In the front, there was a hoisting area for flag, a small playground and some rustic wooden seats. I came to know that every morning they hoist the national flag, sing the national anthem and then

the classes start. In good weather, most of the classes would be outdoors. It was a very nice combination, a school surrounded by nature. The entire school looked like a family. The students appeared to be very happy. I was more than impressed to learn that such a school existed. Deep down I felt very bad, that we mocked this man who had such a big heart and built such a school using his own money, and we called him Ghaotkach.

I talked a little with every one of the staff members and with some of the schoolchildren. They brought some tea for us. I looked around the school and the surrounding area, a little bit more. I thanked Nityananda and his family members for inviting us. Finally, we left the school and started moving towards our jobsite. Nityananda came with us about half the way, on his bike. Throughout that time, I felt some kind of discomfort, for judging such a man whom I really did not know.

Next day, as usual, I went to our jobsite office. The first thing Ganguly asked me, "How was Ghatotkach's school?" Suddenly I reacted, "Do not call him Ghatotkach, call him Nityananda Babu, or Mr. Parui." I felt that they were a bit surprised. Ganguly said to me, "All right, Sir." Then I went to the actual jobsite, as our field work started. The first thing I did was, to see Mr. Parui and say to him, "It was very nice of you Mr. Parui to invite us." He just smiled. Next three months, while I was at that jobsite, I tried to be very respectful to him. I think he appreciated that.

[1]Ghatotkach was the son of Bhima and Hidimba of the Mahabharata. He had a large body with a head like a pot (ghatam in Sanskrit), which was bald (utkacha in Sanskrit).

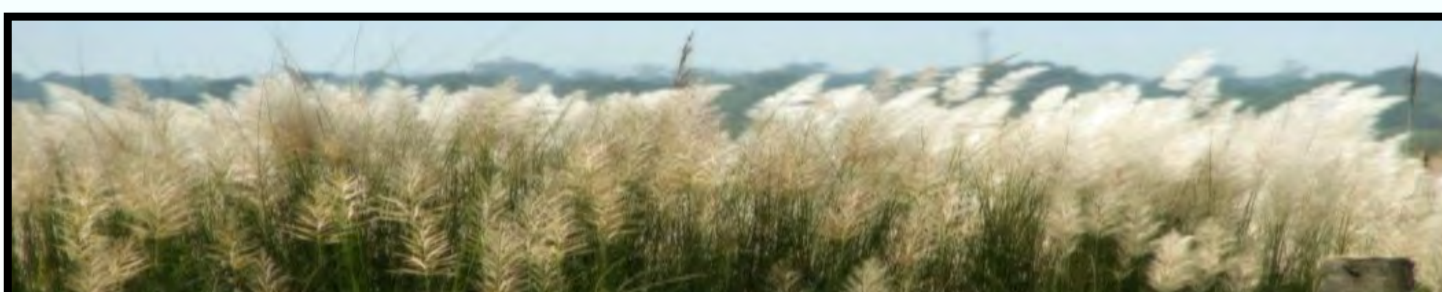

The Walking Chef

A Gastronomic and Historical Walking Tour Through Thessaloniki, Greece

Debasree Sona Callender

Meeting at the famous Hagia Sophia Church (Photo 1), in the metropolitan city of Thessaloniki, Greece (Photo 2) kicked off our adventure for a gastronomic tour that would prove to be insightful taking us down a historical path where I found that Greeks and Indians have several cultural commonalties from both being part of ancient civilizations. We were assembled for an informal and educational food and historical walking tour conducted by a local, knowledgeable Chef that would be filled with tasty food bites accompanied by historical references and commentary.

Photo 2: A View of the City of Thessaloniki, Greece

Photo 1: Hagia Sophia Church, Thessaloniki, Greece

We had a tiny group of three including a woman, Poppy, traveling on her own from Cape Town, South Africa who was curious about everything and loquaciously asking about deeply historic and sometimes odd and irrelevant topics which of course added to her uniqueness. Completing the tour trio was my Viking husband and me, a Bengali American, all

gathered on this food tour with a local, but famous and celebrated Greek Chef, named Panos (Photo 3).

Photo 3: Tour Group including Chef Panos

We had a small multi-cultural gathering amongst us, and everyone seemed agreeable, and ready for the food adventures in the second largest city in Greece. Thessaloniki is known as the capital of the region of Macedonia, and is famous for its vivid culture, its strong history, and of course, the unique and tasty food.

Chef Panos had decided to start our tour at a tea/coffee house (Photo 4), and he had this uncanny ability to understand what type of tea was needed. By our emotions and personality, he matched up the morning beverages for us, whether it be tea or coffee. He had me try a Greek mountain tea which is known for its calming and relaxing attributes. This was perfect for me as our Greek vacation had us on a tight schedule, and constantly on the go. Thessaloniki was rounding out the end and was the relaxing part of our trip, so I was happy to start the day with a relaxing hot tea while my husband was given a high energy Greek coffee, aka Turkish, Arabic, Armenian, and Cuban to name a few, that are almost similar in taste, but all have the jolt of high octane coffee. Our chatty tour mate also preferred herbal, and a non-caffeinated tea, so he chose a local chamomile blend for her. I was impressed that this Greek man knew about the complexities of tea, since the Indians, most Asian cultures, and the British seem to really identify with the art and nuances of teatime. When I men-

Photo 4: Tea/Coffee House, Thessaloniki, Greece

tioned how teatime was coupled with so many delicious Indian sweet and savory snacks, Chef Panos agreed Indian and Greek people loved food gatherings, whether it be small, intimate family gatherings, or larger ones that include the extended family and friends. As we stood amid several historic and ancient Churches, Chef Panos continued to discuss the similarities between Greek and Indian religions. He pointed out that the Greeks have their Gods and Goddesses, and so do the Indians, each representing a different manifestation of God. Meanwhile, our inquisitive tour mate, Poppy, had several questions about specificities of where the tea was made, who made the tea, and which tea she should purchase for her proclivities.

The tea shop led us into Chef Panos's childhood spot that made Bougatsa, a traditional Greek pastry that people conventionally dine on during breakfast or as a snack. He ordered for us all, two different kinds to include one pastry filled with sweet custard, while the other was savory with a type of goat cheese I have never tasted. It is made of phyllo pastry that is wrapped around those ingredients. Still enjoying them with his family and friends, Chef Panos admitted this was a cafe that he and his family had been visiting since he was a child. He pointed out the same owner, in his eighties, who continues to be the loved and adored proprietor of the shop today. This revered businessman and owner of the long-standing Bougatsa shop (Photo 5) didn't have to

Photo 5: Bougatsa Shop, Thessaloniki, Greece

work any longer as he and his family had a comfortable life to live, but he felt nobody could continue with the family traditions of making their specific flavors of Bougatsa. There he is today, continuing his age-old family recipes, and continuing to own one of the most treasured and tasty Bougatsa shops in Thessaloniki. Seeing that gentleman take such pride in his establishment was priceless. As predicted, our wordy new friend, Poppy, asked many

questions of the Bougatsa and the history (most of which were amply answered by Chef Panos prior in the tour), why was it so popular, and if they would fill it with other ingredients such as meats, and potatoes, which I personally thought was a very insightful question. Although that might not make it traditional Bougatsa at all.

After that exceptional snack experience, Chef Panos led us to the famous and historical market in Thessaloniki called the Kapani Market (Photo 6). Known for being the largest and oldest open-air market,

Photo 6: Kapani Market, Thessaloniki, Greece

it is a constant bustling burst of activity visited by the locals and tourists in the heart of the city center of Thessaloniki.

Kapani contains a whole assortment of shops showcasing fresh and dried herbs, spices, variety of olives and nuts, meat, fish, veggies, fruits, and other vendors selling shoes, clothing, and much more (Photo 7).

Photo 7: A Storefront at Kapani Market, Thessaloniki, Greece

Chef Panos told us that throughout the 20th century, this Kapani Market was the central and most crowded marketplace in Thessaloniki. This market was a major supplier of an array of his fresh produce and other items for when the Chef owned his restaurants. He pointed out many types of herbs and teas only found in Thessaloniki and other local regions of the country. Chef also talked about saffron, and the

unique tastes, uses, and most discerning ways to use it in cooking. He mentioned again the similarities between Greek saffron and Indian saffron, humbly telling us about his grandmother's villa where he has a sustainable farm. Panos grows fruits, vegetables, and raises livestock. This farm to table concept is for his family only, and not for profit. One of the more interesting stories he told us is that he has a very old, and dear friend from Turkey who also grows saffron. They have saffron growing contests, and the Chef told us that this time, he won for the quality and taste of his saffron harvest. The winner cooks a fantastic meal to show off his proud cooking styles infusing and incorporating the gathered saffron, as well as his superior saffron growing talent, much to his friend's chagrin who also grows saffron. Later as we continued our walking tour, Chef Panos recognized a friend and greeted him warmly. He told us that this friend was actually the very friend with whom he had the saffron contest!

The spot I was most anxious about was the cheese shop as I am lactose intolerant of certain types of cheeses and dairy. I had informed Chef Panos, and he said I may be pleasantly surprised about how well I can tolerate the cheese in Greece. He asked me to trust him. He took us to one of the oldest cheese stalls in an area called Athonos packed with fresh markets and green grocers. A lady owned the cheese shop (Photo 8); her family had been running it for generations, and though she didn't know English, she knew her cheeses. Each spot Chef took us to, they were ready and prepared for our arrival, so she immediately brought out a

Photo 8: Family Cheese Shop, Thessaloniki, Greece

board with several different types of cheeses displayed. Chef Panos started describing what each cheese was, how it was processed differently in Greece, and the proper way to taste it on your palate. We had several varieties of hard parmesan cheese infused with wine, chili pep-

pers, and even mint. Then we tasted a range of hard goat cheeses, some also infused with herbs such as rosemary. There were crispy parmesan sticks to eat along with the cheese, so there were creamy textures from the cheese coupled with the crunch of the crackers. Lastly, they gave us some freshly made kefir to taste. To my horror, it looked like a tiny cup of pure milk.

However, kefir is a cultured dairy drink that is a fermented beverage, tangy, slightly sour flavor, but a rich source of probiotics. I was dumbfounded that I could drink this, which I did as I trusted Chef Panos not to intentionally give me anything to cause issues. He was correct. It was refreshing, and I had no negative effects from eating or drinking dairy. I do want to point out, goat cheese is not dairy, nor is it processed in the same manner as dairy, so I had no adverse effects from it.

After the cheese shop, we headed to a lively market where Chef Panos went to the fridge and brought out 3 small plates filled with fresh salad accompanied by 3 shot glasses filled with a clear liquid. You could sense the closeness in the proprietor couple and Chef Panos. He informed us that this market was his supplier for many different items for his restaurants, and he had been coming to this spot for decades. As we dined on the meze or small appetizers of leafy greens, tinged with lemon juice and olive oil, along with tiny anchovies and kalamata olives, we also sipped on the drink the Chef had provided for us. This Greek liquor, tsipouro is a distilled spirit made from pomace, or grape skins, seeds, and stems. Chef Panos told us that the Greeks can sit and have meze and sip on tsipouro for hours with their friends on a day off from work, as the day goes on, and the groups get livelier.

He also told us a story about the Greek Orthodox priests and monks who produce the church incense onsite, and it's an ancient process using local dried herbs, and a process these priests have perfected over the centuries. Chef Panos was touched when I wanted to purchase 2 boxes. Each time we light it now, the aroma and bouquet take us back to Thessaloniki and our experiences.

Regarding the churches, there was a significant number with spectacular architecture that we kept seeing on our tour. Across from our first stop at the tea shop, there was an ancient church where he showed us that they built the new church

Photo 9 A New Church Built Over an Ancient Church, Thessaloniki, Greece

on top of the old church (Photo 9) as it was hallowed grounds, and they could not remove the old church for religious reasons. He also had us walk into another church where they were having a service with priests in long black robes singing and chanting Greek scriptures, with the familiar smell of incense burning, the wooden decorative chairs lined up for the attendees, and the intricately carved ceilings and furniture. The whole experience was peaceful, and my mind and senses took me back in time to my childhood when I would read all the stories of the Greek mythologies and its history. We also walked by the White Tower and the Rotunda (Photo 10), which are two notable historical landmarks in Thessaloniki.

Photo 10: Rotunda and White Tower, Thessaloniki, Greece

The White Tower was originally built by the Ottomans in the 15th century, and provided a prison, but now it is a museum that offers panoramic views of the sea and the city. The Rotunda was commissioned by a Roman Emperor around 306 A.D., perhaps as a mausoleum or temple. It is currently a museum after it went through a couple of conversions from a Christian church to a mosque. It is one of the oldest monuments in Thessaloniki. We were finally on the last leg of the tasting which we finished up at a local bar. Chef Panos, Poppy, my husband all had some local Greek brews that Chef Panos highly

recommended, while I had a popular sparkling mineral water that's sourced from a natural spring near Thessaloniki, and is known for its unique mineral composition of calcium, magnesium, lithium, and silicon. And of course, more food came. A hot, bubbling miniature casserole dish came filled with a baked zucchini delight, and the exclamations of glee were heard from us as the flavors hit our palates, which silenced even the ever-chatty Poppy.

This was a sensational experience of spending half the day with this knowledgeable, humorous, and talented Chef, keeping us enthralled with his commentary, and taking us to his favorite places since he was a child. We kicked it off at a tea shop, drinking local teas and coffees, and moving on to eating Bougatsa in a café he had been dining at since he was a youngster. Next, on the tour, we moved towards the oldest market, Kapani Market, with Chef giving us the details of this historical place, and the variety of stalls housed there. Cheese tasting at his friend's cheese stall was a surprise and gave me relief and satisfaction that I was able to enjoy dairy again so heartily. But our eating was still not over, even though our stomachs were saying otherwise. We were taken to a cheerful and bustling market where we dined on fresh meze and sipped on strong tsipouro, complete with Chef Panos continuing to educate us on everything in sight. Then, lastly, we ended the fun and festive day at a bar and uttering the Greek word for cheers which I will say to you now, Yamas!

Sunset on Zambezi River, Zimbabwe
- Dipak Bagchi

An American President I Truly Admired

Benoy R. Samanta

America's 39th President, James Earl Carter, Jr., popularly known as Jimmy Carter died at his residence in Plains, Georgia on December 29, 2024, at the age of 100. He was the longest living U.S. president. He was born on October 1, 1924, in Plains, Georgia to James Earl Carter, Sr., and Bessie Lillian Gordy Carter, popularly known as, Lillian Carter.

President Carter was a one-term president from January 20, 1977 to January 20, 1981. He was Georgia's governor for four years from 1971 to 1975. Outside of those years, he was a private citizen and maintained his primary residence in Plains, Georgia. He spent, however, eleven years as a naval officer. I cannot write anything on President Carter that has probably not been written already somewhere or other. However, I have a couple of fond memories of him that I want to share. The day President Carter was inaugurated at the U.S. Capitol, I was working at an office in Washington D.C. just two blocks from Pennsylvania Avenue and a short walking distance from the U.S. Capitol building where the inauguration ceremony was taking place. Traditionally Presidents, after taking oath of the office and attending an inaugural luncheon at the U.S. Capitol drove down the Pennsylvania Avenue to the White House. However, Mr. Carter requested that the traditional Inaugural luncheon event hosted by the Joint Congressional Committee be cancelled. He also decided to walk along with his wife, Rosalynn Carter and their eight-year-old daughter Amy, all the way from the Capitol building to the White House. This was the first time a newly elected President did so after taking the oath of the office. Since that time, all U.S. subsequent presi-

President Jimmy Carter

dents walked at least part of the approximately two-mile route.

The news of President Carter walking down the Pennsylvania Avenue after inauguration quickly spread in our office. Hearing the news, my friend Charles Flannigan and I wasted no time leaving the office hurriedly to stand by the roadside with the rest of the crowd to get a glimpse of the newly elect President and his family.

Almost every day, Charles and I spent part of our lunch break visiting various museums and art galleries in the National Mall. That was an exciting area in D.C. to roam around. I remember climbing the Washington Monument one day using the stairway. I mention Charles because one day, while walking around the U.S. Capitol building, he asked me if I would like to get a haircut. The question surprised me a great deal as there was no barber shop anywhere near that area and I didn't think either one of us needed a haircut badly. Charles took me to a barbershop inside the Capitol building, where all the senators and congressmen get their haircuts and their shoes polished. . It was a large room with all four walls covered with large poster size pictures of notable former senators and congressmen getting their haircuts. Charles assured me that we would have no problems getting our haircuts there. According to him, it was, after all, a public building. Charles knew all these intricate details because his wife was an aide to one of the congressmen from his home state, which he didn't announce before. In any case, we got our hair cut for only 75 cents each. Quite a deal, even in those days.

By all accounts, Carter's presidency was not a successful one. It was beset by a bad economy. Additionally, Soviet invasion of Afghanistan, seizure of American hostages from the U.S. embassy in Iran, and a disastrous military failure to rescue those hostages cost him the reelection. Regardless, I always admired him as a noble and principled man, the values he preached, and the examples he set during and after his presidency. His major achievement, while in office, was the Camp David peace agreement between the Arabs and the Israelis.

Jimmy Carter, however, gained all the respect and admiration for all the contributions he made after his presidency. In a television interview on his seventieth birthday, ABC's Barbara Walters asked, "Mr. President, looking back on your time as a Submarine officer, a farmer and busi-

nessman, as governor, and in Washington, what has been the best of all?" President Carter replied, "By far, my best years are those I'm enjoying now, since Rosalynn and I left the White House." In fact, Jimmy Carter's post-presidency is widely considered as the most respectful in the U.S. history. Jimmy Carter will be remembered in history for his work through the Carter Center in Atlanta, Georgia.

The first presidential library was built in 1941 for Franklin D. Roosevelt in 1941 in Hyde Park, New York, while he was still the president. The Jimmy Carter Library and Museum along with the Carter Center were both dedicated in October 1986. The Carter Center, a non-governmental organization, was founded in 1982 in partnership with Emory University, whereas the Library and the Museum are administered by the National Archives. The Carter Center's main objectives are to advance human rights and alleviate human suffering by resolving conflicts, promoting democracy and human rights, preventing diseases and improving healthcare, particularly, in poor countries. The activities of the Carter Center earned him world fame, universal respect, and a Nobel Peace Prize in 2002. In 2003, our daughter, Monica, joined Emory University for her undergraduate studies,

while I was on an assignment in Saudi Arabia and spent a number of years over there with my wife. A year later, we bought a condominium within a short distance from the university for her to stay and for us to spend some time during our vacation from work. Soon we discovered that we were also within a short walking distance from the Carter Center and the Presidential Library. This was one of the nicest areas in Atlanta, called the Druid Hills. The neighborhood is historically significant for its well-preserved 20th century landscape architecture and suburban developments by Frederick Law Olmsted. He was considered to be the father of landscape architecture in America.

Monica's next-door neighbors were two retired professors from Georgia Institute of Technology, popularly known as, Georgia Tech. The husband, Anton, was a professor of chemical engineering and his wife, Helen, a professor of comparative literature. They treated Monica very affectionately and we also became very friendly with them. Every day, they went out for lunch and Helen would knock on our door to ask if we would like to join

them. We did join them a few times and noticed a rather routine habit. They would go to the same restaurant every day, order the same food, consisting of fresh fruits, salads and a large portion of cottage cheese, will eat exactly half of what they ordered, and will bring the rest home for supper in the evening. Helen was fond of telling stories and one day, she revealed that our unit and their unit, which shared a common wall, were Jimmy Carter's campaign headquarter in Atlanta when he ran for president in 1976. I was pleasantly surprised and delighted to know that we were living in a rather historic place. Anton suffered a stroke and was a man of few words. However, one day, he suggested that we visit the Carter Presidential Library, if we hadn't done so already.

One morning, I decided to walk over to the Carter Presidential Library. When I arrived there, I noticed two entrances, side by side, with no signage indicating which door led to the library. There was no security guard or any booth for entrance fees. There was no one around to ask. Perhaps, it was too early for any visitors. I decided to go through the door on the left. Moments later, I found myself in the middle of a large well-lighted and beautifully decorated room with chandeliers, and sofas scattered around, but not a single person in sight. I felt I was in the wrong place but kept on walking. A short distance away, I found myself in front of an office. I had a quick glance inside the office and noticed a man at a large desk with his head down, as if, concentrating on some reading materials. There was a woman outside the office sitting at a desk, whom I hadn't noticed earlier. As soon as she saw me, she raised both hands, as if in panic, and signaled me to stop right there. She came running at me and wanted to know where I was heading. When I mentioned that, she reminded me in a whispering voice that I was in the wrong place, and it was Mr. Carter's private office. She understood that I made a mistake and graciously offered to escort me to the library area, which was in a different area of the building. Looking back, if I made such a grave error at the present time, I would perhaps be shot by security personnel before asking any question.

"How often President Carter comes to this office?" I asked the woman.

"On the average, once a month," she replied.

"Why is he in the office today?"

"A family is donating their Estate to the Carter Center, and he is here to accept that donation." She continued, "If you hang around in the library for a while, you will be able to see him." President Carter was living in Plains, Georgia, which is about 160 miles from Atlanta.

The library was rather plain compared to other presidential libraries I visited later, but quite impressive with pictures, videos and documents, and numerous other memorabilia of his presidency, like all other presidential libraries are. It appeared more like a research center as I saw a number of people going through various documents. A short time later, I, along with all other visitors, gathered against a large floor-to-ceiling glass window to watch the brief ceremony in the yard, where Mr. Carter accepted the donation. That was the second time I saw him after the inauguration day in 1977.

For reasons I cannot explain why, I followed his life till the day he died. He authored thirty books and co-authored two more. Except for the first book, titled, "Why Not the Best," written in 1975, while he was governor and decided to run for president, all other books were written after the presidency. Twenty of his books became NY Times bestsellers. He was considered to be the most prolific writer of all presidents in the last century. In one television interview, he revealed that the royalties he received from his book sale helped him financially, as if to suggest that he had no other financial support. It is said that President Carter seldom received speaking fees and when he did, he typically donated the proceeds to his charitable foundations. Other presidents typically receive $250,000 to $500,000 for a single engagement.

In July 1979, President Carter delivered a "Crisis in Confidence" speech from the White House. That speech sparked a significant debate among the experts about its intent. His critics named it a "Malaise" speech. However, many historians argued that the President offered an honest assessment of the challenges the nation faced. That speech may have contributed to his loss to his challenger Governor Ronald Reagan in 1980 presidential election. Recent analysis of that speech, nearly 46 years ago, acknowledged its prescience or foresight of President Carter, noting that his warnings about materialism and a need for a renewed sense of purpose resonate in the present day.

Jimmy Carter's accomplishments in his post-presidency is much larger than what I have described in this short write-up. There is a large number of reading materials available in the public domain for the interested readers. In the end, his post-presidency is now considered to be the most impactful in U.S. history. He lived a full life- from rural obscurity as a peanut farmer to American presidency, to world fame and universal respect.

Rosalynn Carter died on November 19, 2023. Both Jimmy and Rosalynn Carter are buried on the grounds of the house by a willow tree on the lawn of the property. The house is now part of the Jimmy Carter National Historical Park and will be turned into a museum and opened for public tours by the National Park Service.

Sunset on Atlantic Ocean at Cape Town, South Africa

- Dipak Bagchi

Arka's Musings

Som Ganguly

Arka, which in Bengali language means Sun, is a retired medical care provider. Inspired by childhood experiences, he had a lifelong fascination with extraterrestrials, popular science, and encounters with influential figures such as Dr. Steven Greer. He has learnt that so much of work and the congressional hearings are going on to understand the Unidentified Flying Object (UFO) sightings or the newer term Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). Arka went to Mount Shasta in Northern California last year to meet with Dr. Steven Greer and his large group of believers of extraterrestrials. Dr. Greer is an American ufologist and a retired medical doctor. Looking at the vast Universe makes Arka wonder about what Dr. Carl Sagan, the American astronomer, planetary scientist and science communicator, said: "The universe is a pretty big place. If it's just us, seems like an awful waste of space." During his childhood days Arka used to lie on the roof of their four-storied home, and after sunset he used to stare at the dark sky with millions of stars, and he used to wonder when he could see God appear from one or many of these stars. Not too long after, Erich Von Däniken stirred up the intellectual world with his series of books. Arka's uncle gifted him the Bengali translations of those books and Arka, as a hungry kid, swallowed five such books in a week.

That is when he developed the idea of extra-terrestrials (E.T.) Shortly after he witnessed Steven Spielberg's "E.T. the Extra-Terrestrial" and "Close Encounter of the Third Kind," Robert Jemekis' "Contact" and so on. Childhood days were filled with such exciting moments. He loved the new territories opened by the physicists, such as Dr. Brian Greene, Dr. Michio Kaku, Dr. Kip Thorne, Dr. Stephen Hawking, Dr. Paul Davies, and many more. He always wondered about the abductees.

Encounters, Meditation, and Search for Other Species through Travelling into other Dimensions

Arka, spends many nights documenting unusual light phenomena, sometimes using infrared or x-ray cameras. His observations align with countless government

declassified documents and expert testimonies, which can be accessed in federal government libraries. Arka, who lives on top of a mountain with a view of the Pacific Ocean, spends much of his time gazing out over the water. Recently, he was introduced to the UFO phenomena and meditation techniques aimed at contacting extraterrestrial beings. Arka encountered strange phenomenon of light forms as he was meditating guided by Dr. Greer on Mount Shasta last year during Christmas and participated in specialized training in search of other species.

Training and UFO Contact Experiences

Dr. Greer is known for leading hundreds of thousands of people in training to practice meditation techniques intended to summon UFOs and contact extraterrestrials. There are locations, such as Arizona, Nevada, and notably Mount Shasta, where unusual electromagnetic phenomena are frequently observed. Reports indicate that compasses sometimes do not function at Mount Shasta and that high levels of radiation are often detected.

During the week-long training, Arka and his group witnessed distinguishable lights that appeared near their meditation site. These lights assumed various forms and geometric patterns before disappearing. The experience transformed Arka from a skeptic into a strong believer, and he now regularly spends evenings on his balcony, staring at the Pacific in search of similar phenomena. According to declassified files, there are frequent UFO/UAP sightings in regions between Catalina Island and the coastline, the Gulf of Mexico, San Diego, and north of San Francisco Bay. These phenomena are also reported worldwide.

Exploring Other Dimensions

Arka's experiences inspired him to explore the concept of other dimensions. Practitioners like Dr. Greer believe that these dimensions exist close to our own and can be accessed through focused meditation. Arka tries to penetrate these dimensions by concentrating deeply, following in the footsteps of Israeli British illusionist, magician and self-proclaimed

psychic like Uri Geller, who is known for mind-body work and has trained many in metal interaction.

Metal Interaction and Energy Forms

Uri teaches that objects around us, even metals, possess consciousness. Participants are encouraged to telepathically connect with these objects, expressing goodwill and friendship. Many reports indicate that about 80% of the attendees were able to bend or reconfigure stainless steel objects and, in some cases, generate heat or light without electricity. This “free energy” concept echoes the ideas of Serbian American engineer and inventor Nikola Tesla and has gained a growing population of believers and practitioners. Arka regularly attends in-person training and group sessions to further develop these abilities.

Personal Encounters and Global Phenomena

Arka hopes to witness close encounters with unexplained lights over the Pacific and believes these phenomena can offer insight and even assistance to humanity. Reports of extraterrestrial contact date back years and are now happening with increasing frequency, including among astronauts and military personnel. With the declassification of thousands of pages of government evidence, this phenomenon is now recognized as a matter of scientific inquiry, with “black budgets” supporting ongoing research since the 1940s.

Scientific Perspectives and Theories

Notable scientists such as Stephen Hawking have discussed the possibility of multiple dimensions, suggesting that our limited consciousness restricts what we can perceive. Some believe that expanding our mental faculties—perhaps increasing brain activity by even a small percentage—could unlock many unknowns. CRISPER genetic engineering may someday create super-intelligent human beings with higher brain power who may understand these other dimensions around us. Theories such as String theory propose that hidden dimensions contain answers to some of humanity’s greatest mysteries. One such opinion was proposed by fa-

mous Italian American mathematician Dr. Eugenio Calabi. His conjecture was proved by Chinese American mathematician Shing-Tung Yau. This phenomenon is now known as Calabi-Yau manifold and has numerous convoluted dimensions (See Figure 1) right at the tip of our nose. All we need to do is perceive it.

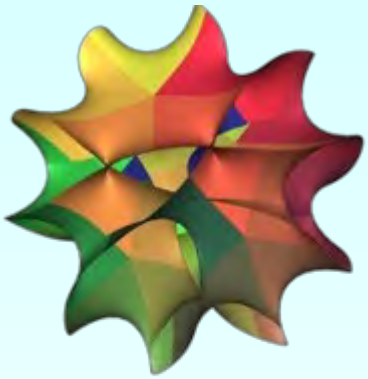

Figure 1: Calbi-Yau Dimensions

Conclusions

Arka, spends many nights documenting unusual light phenomena, sometimes using infrared or x-ray cameras. His observations align with countless government declassified documents and expert testimonies, which can be accessed in federal government libraries. While some remain skeptical, a growing population is exploring these experiences, seeking knowledge and understanding through both observation and personal practice.

The message is clear: by extending our consciousness and embracing new possibilities, we may uncover truths about our universe.

"Love is of three kinds: unselfish (Samartha), reciprocal (Samanjasa), and ordinary or selfish (Sadgarana). Unselfish love is of the highest kind. The unselfish lover seeks only the welfare of the beloved, and does not care even if he himself suffers pain and hardship in consequence. The second kind of love is mutual love in which the lover desires not only happiness of his beloved, but has an eye to his own happiness also. Selfish love is the lowest. It makes a man only care for his own happiness without having any regard for the weal or woe of the beloved."

_ Sri Ramakrishna

Rules for Article Submission to Kheya

1. All articles submitted must be original unpublished articles, and accompanied by the author's phone number, and email address. Submitting an Article would be a confirmation that it neither has been published, nor submitted for publication elsewhere. Articles received from BASC members will always receive priority for publication over those from non-members.

2. **One or more articles together from the same author shall not exceed 2000 words in count.** In rare cases exceptions will be made for extraordinary articles. The articles must be proofread for typos and spelling errors before submission. Articles requiring too many corrections may not be published.

3. Only Bengali and English articles typed in Microsoft Word format will be accepted; PDF submissions will not be considered. Bengali articles must be typed using Unicode-based input tools such as Microsoft Indic Language Input Tool, Google Docs, Avro, or any other Unicode-compliant platform. All photographs included must have appropriate and descriptive titles.

4. Email Articles to Kheya Editorial Board (KEB) at kheyausa@gmail.com

5. All sketches and paintings may be in black and white or in color. Illustrations or photographs in Articles should be original and preferably not collected from the internet. If some are taken from the internet those should give credit to the internet source.

6. Articles for Kheya will be accepted throughout the year. However, due to various constraints if an accepted article is not published in the current edition, it will be considered for publication in the following edition.

7. Publishing worthiness of any submission will be collectively decided by the KEB members, This decision is final.

KHEYA

51ST YEAR, 2025